সুইডেন শান্তির দেশ

কমোডোর (অবঃ) এম আতাউর রহমান

সুইডেন শান্তির দেশ

কমোডর (অব) এম আতাউর রহমান

পালাবদল পাবলিকেশন্স

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সুইডেন শান্তির দেশ

কমোডর (অব) এম আতাউর রহমান

প্রকাশক

আবদুস সালাম

পালাবদল পাবলিকেশন্স

১১৯/৪, ফকিরের পুল (৩য় তলা)

ঢাকা-১০০০।

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৯৮

স্বত্ত্ব: লেখক

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ

পালাবদল পাবলিকেশন্স

দাম : ৭০ টাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

প্রিয় সাথী
তুমি নাই
নিয়েছ বিদায়
শুধু তোমাকেই দিলাম।

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

জীবন তরঙ্গ (১৯৯৫)
আরব বিচিত্রা (১৯৯৮)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

ভ্রমণ কাহিনী শুধু যে ভ্রমণ কাহিনী তা-ই নয়, তা একই সঙ্গে স্মৃতিকথনও বটে। একজন মানুষ যখন বিদেশে যান তখন বিদেশকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেন তারই বিবরণ পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। বিদেশের চিত্র তাতে যেমন পরিস্ফুট হয় তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণকারীর একটা নিজস্ব অভিজ্ঞতাও ধরা পড়ে। একজন ভ্রমণকারীর কৌতুহল এবং দেখবার ভঙ্গী অন্য ভ্রমণকারীর কৌতুহল ও দেখবার ভঙ্গীর সঙ্গে মিলবে না। এভাবে ভ্রমণ কাহিনী একটা স্মৃতিসত্তারও পরিচয় বহন করে। আবার অনেক ভ্রমণ কাহিনী আছে যেগুলোতে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচিতি নেই; শুধুমাত্র গাইড বই দেখে একটা দেশের ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণী দেওয়া হয়। এ ধরনের ভ্রমণ কাহিনী কিন্তু অজস্র। আমাদের দেশে যারা জীবনে কখনও বাংলা লেখেননি, তারা বিদেশ ঘুরে এসে 'চীন দেখে এলাম', 'আমার দেখা তুরস্ক' এ ধরনের অনেক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। সেগুলো কিন্তু সাহিত্য হয়নি। সেগুলোকে 'ট্যুরিস্ট গাইড' হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। এর মধ্যে কমোডর (অবঃ) আতাউর রহমানের লেখাগুলো বিশেষ ব্যতিক্রম।

তাঁর লেখার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তিনি তার ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যেই ঐ দেশের যে সব মানুষের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়েছে তাদের পরিচয়লিপি তিনি তুলে ধরেছেন। লেখাগুলো যখন 'বিক্রমে' বেরুচ্ছিলো তখন আমি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছিলাম। পাঠ করতে গিয়ে আমার কখনও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। বর্ণনাকারী যদি নিজের দেখাকে পাঠকের দেখায় পরিণত করতে পারেন তবেই তার লেখা সার্থক হয়। আতাউর রহমানের লেখার মধ্যে এই বিশিষ্টতাই আছে।

কমোডর (অবঃ) আতাউর রহমানের ভ্রমণকাহিনীগুলো স্মৃতিকথনের কাহিনী নিয়ে উজ্জ্বল। তাঁর ভাষা সাবলীল ও গতিময়। মাঝে মাঝে কৌতুকের আশ্রয় আছে, তার ফলে পাঠকের চিত্ত প্রফুল্ল হয়। তাঁর রচনা তথ্য ভারাক্রান্ত নয়, কিন্তু তথ্যসমৃদ্ধ।

আমি লেখককে বাংলাদেশের সাহিত্য অঙ্গনে স্বাগত জানাচ্ছি।

সৈয়দ আলী আহসান
৬০/১, উত্তর ধানমণ্ডি
ঢাকা-১২০৫
জুলাই, ১৯৯৮

www.pathagar.com

লেখকের কথা

এই বইটি লেখা হত না যদি না আমার প্রিয় সাথী–আমার জীবনের স্নিগ্ধ তারকা–আমার স্ত্রী নাজমা রহমান সুইডেন যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি না করতেন। সুইডেনে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা জনাব এস এ হাসেম ও তার পরিবারবর্গকে ঘিরেই এই বইয়ের উপাখ্যান। স্ত্রীকে সাথে নিয়ে পর্যটক হিসেবে আমার জীবনেরও শেষ বিদেশ ভ্রমণ ছিল সুইডেনে। তারপরই তিনি ১৯৯৭ এর ৪র্থ জুলাই স্ট্রোকে (সাব অ্যানাকরয়েড হেমোরেজ) আক্রান্ত হয়ে ১০৯ দিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে–২১ শে অক্টোবর, মঙ্গলবার, ইহধাম ত্যাগ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে বেহেস্তবাসিনী করুন।

'সুইডেন শান্তির দেশ' বইটি বহু স্মৃতি বিজড়িত বই। এই বইটি যখন সাপ্তাহিক বিক্রমে ধারাবাহিকভাবে বের হচ্ছিল তখন অনেকেই এর নামকরণ নিয়ে নানা মন্তব্য করছিলেন। 'সুইডেন শান্তির দেশ' নামটি আমি দিয়েছিলাম কেননা আমি ও আমার স্ত্রী সুইডেনকে প্রকৃত অর্থেও সেভাবেই পেয়েছি ও উপভোগ করেছি।

এই বইটিতে সুইডেনের ইতিহাস, সুইডেনের ভৌগোলিক পরিবৃত্ত, সুইডেনের সমাজ জীবন, আধুনিকতার দিক থেকে সুইডেন, শিক্ষা ও কৃষ্টিতে সুইডেন, সুইডেনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সাধারণ পর্যটকের মত দৃশ্যাবলী দেখার ছলে আমি একদিকে অতীতের সমজাতীয় অভিজ্ঞতা টেনে এনেছি আবার অন্যদিকে ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় জীবনে শিক্ষণীয় অংশকে প্রতিফলিত করেছি। আমার বিশ্বাস, পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা শিক্ষণীয় ও বর্জনীয় অংশগুলোকে বিচার-বিবেচনা করে দেখি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করতে পারব।

পরিশেষে আমি পালাবদল পাবলিকেশনস্ লিমিটেড ও পাক্ষিক পালাবদলের সম্পাদককে বইটির মুদ্রণের কাজ হাতে নেবার জন্যে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট আবেদন–খোলামন নিয়ে বইটি পড়ুন এবং বইটির গঠনমূলক অংশের আলোকে আপনিও জাতীয় জীবনে যেখানেই সুযোগ পান অবদান রাখুন।

এম আতাউর রহমান

www.pathagar.com

সুইডেন শান্তির দেশ

।।১।।

আগমন

বেশ কিছুদিন শুধু এগিয়েই চল্‌ছি। এই চলার পথেই পহেলা ডিসেম্বর ১৯৯৬ সনে লন্ডন হিথরো বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম সকাল ৮ টায়। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বন্দর হিথরো থেকে প্রতি মিনিটেই একটি করে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ওঠানামা করেও লন্ডনের চাহিদা মেটাতে পারছে না। তাই গড়ে উঠেছে গ্যাটউইক বিমান বন্দর এবং সম্প্রতি 'মাইলেম' নামক একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মালিকানায় স্থাপিত হয়েছে 'লন্ডন সিটি' বিমান বন্দর। প্রাইভেট উদ্যোগে লন্ডনের পূর্ব প্রান্তে ডক অঞ্চলের অব্যবহৃত জলাভূমি ভরাট করে এই বিমান বন্দরটি নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রধানত ইউরোপের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে এই বিমান বন্দরটি।

বিমান বন্দরে আমার জামাতা ডকটর আখতার হুসেন আমাকে অভ্যর্থনা জানালো এবং তাদের সম্প্রতি কেনা হার্টস্‌গ্রোভের বাড়ীতে নিয়ে উঠালো। এই বাড়ীটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং শহরের কেন্দ্রস্থলের সন্নিকটে বনাঞ্চলে সদ্য সৃষ্ট আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। এই আবাসিক এলাকাতে সর্বমোট ৫৪টি বাড়ী আছে এবং প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ীতেই রয়েছে বড় বড় গাছ। এই গাছগুলো নিজস্ব জায়গায় অবস্থিত হলেও কাটা নিষেধ। ইংল্যান্ডে গাছসমূহ সংরক্ষিত। গাছ কাটতে হলেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন। এ ভাবে আইন করে তারা পরিবেশকে সুন্দর রাখে এবং শহরসমূহকে সবুজে আবৃত রাখে।

নূতন বাড়ীতে আমার প্রধান আকর্ষণ ছিল আমার সর্বকনিষ্ঠা নাতনী 'যানান'। বয়েস মাত্র তিন মাস এরই মাঝে নানাকে উপহার দেবার জন্যে হাসতে শিখেছে এবং ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসিটি লেগেই আছে।

এ যাত্রায় লন্ডনে মাত্র তিন দিন থাকব। তারপরেই আমাদের ভ্রমণ তালিকায় আছে সুইডেন যাত্রা। ৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭ টায় হিথরো বিমান

www.pathagar.com

বন্দরের ৪নং টার্মিনাল থেকে শুরু হবে আমাদের সুইডেন যাত্রা। ৯৬০০০ হ্রদে ভরপুর সুইডেনকে হ্রদের দেশ বলেই আখ্যায়িত করা যায়। ভোর রাত সাড়ে ৪টায় মিনি ক্যাব করে রওয়ানা হলাম। লন্ডনের যানবাহন ব্যবস্থা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। গত রাতেই টেলিফোনে 'মিনিক্যাব' অর্থাৎ ছোট ট্যাক্সির সাথে যোগাযোগ করে বলে রাখা হয়েছিল যেন ভোর রাত সাড়ে ৪ টায় হিথ্‌রো বিমান বন্দরে যাবার জন্যে গাড়ী পাঠায়। যথাসময়ে ক্যাব এল এবং আমাদের বিমান বন্দরে পৌছালো। ৪০ কিলোমিটারের এই যাত্রার ভাড়া লেগেছিল মাত্র ২৮ পাউন্ড অর্থাৎ আমাদের টাকায় ১৮০০ টাকার মত। বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে আমি ও আমার গৃহিণী সুইডেনের পথে আকাশচারী হলাম ঠিক সাড়ে ৭ টায়।

শীতকালে স্ক্যানডেনেভিয়ান দেশসমূহ অর্থাৎ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যান্ড সাধারণত অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে। তাই অনেক বন্ধুই উক্তি করেছিলেন যে, এ সময় যাওয়াটা মোটেই ঠিক নয়। আমার মতবাদ ছিল যে, অন্ধকারেরও রূপ আছে। বরফের শুভ্রতা অন্ধকারেই ফুটে ওঠে। শুভ্র বেশ পরিহিতা বনানীর রূপ কি গ্রীষ্মকালে দেখা যাবে? তাই শীতকালের সুইডেন দেখতে হলে শীতকে ভয় পেয়ে সিটকে থাকলে চলবে না। আমার সহধর্মিণীরও তাই মত। সুতরাং আনন্দ বিহারে আমরা দুজনে এগিয়ে চললাম নির্ভাবনায় যে ভাবে বিবাহিত জীবনের শুরুতে-পঞ্চাশ দশকের প্রথম থেকেই দেশ-বিদেশে, সাগরে-বন্দরে, পথে-প্রান্তরে, পাহাড়-পর্বতে, বন-জঙ্গলে বিচরণ করেছি।

জানালার পাশে বসে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাতেও যেন শীতের পরশ পাচ্ছিলাম। দারুণ শীতের কথা ভেবেই ঢাকা থেকে ফ্লানেলের টাইট পাজামা তৈরি করে নিয়ে এসেছিলাম। ফ্লানেলের পাজামা ট্রাউজারের নিচে পরে আছি বলে শরীরটা গরম থাকছে। তা ছাড়া উলের সোয়েটার, মাফলার, উলের টুপি, ওভারকোট ইত্যাদি নিয়ে এসেছি। তাই সমস্ত দিক থেকেই আমরা উভয়েই সুরক্ষিত। এর কদিন পরে 'মেলারেন হ্রদে' হিমাঙ্কের ৫ ডিগ্রি তাপমাত্রার নিচের আবহাওয়ায় জাহাজে করে যাচ্ছিলাম, তখন আমাদের গাইড (জাহাজ কোম্পানির ভ্রমণবালা-ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনায় পারদর্শী) রসিকতা করে বলছিল যে, সুইডেনের আবহাওয়া সব সময়ই ভাল যদিও অনেকে বিরূপ মন্তব্য করে থাকে-আমরা বলি যে, আপনারা উপযুক্ত গরম পোষাক পরিধান করুন এবং আবহাওয়াকে মোকাবেলা করার মনোবৃত্তি নিয়ে পথে বেরোন-দেখবেন যে এই হিমশীতল সাগরের হাওয়া কেমন উপভোগ্য মনে হবে। সুন্দরী ভ্রমণবালার বাচনভঙ্গী এবং চোখে-মুখে হাসি মিশিয়ে মিষ্টি করে কথা বলার কৌশলে আমরা সকলেই সে দিনের ঠাণ্ডাকে তুচ্ছ করে মেলারেন হ্রদে তিন ঘন্টা পরম নিশ্চিন্তে কাটিয়েছিলাম।

পর্যটকসুলভ মন নিয়েই লিখছি যে, ভ্রমণকে আনন্দদায়ক করতে হলে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই ভ্রমণে বেরুতে হয়। যদি মেঘের দেশে যেতে হয় তা হলে অবশ্যই

www.pathagar.com

ছাতা ও রেনকোট নিয়ে বেরুতে হবে-যদি আঁধারের যাত্রী হন তাহলে আলোর উৎস সাথে নিয়ে চলবেন। আর সমস্ত ক্ষেত্রেই মনোবল থাকা চাই মজবুত। পথে বের হবার আগেই পথের ছক মনে এঁকে নেবেন। ভ্রমণ তখনই হবে নিশ্চিন্ত আরামদায়ক।

সুইডেনের দক্ষিণ অঞ্চল দিয়ে যখন উড়ে যাচ্ছিলাম তখন নিচে দেখা যাচ্ছিল শুধু সাদা আর সাদা। মনে হচ্ছিল ধূনো তুলো অবিচ্ছেদ্যভাবে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এই সাদা আবরণ প্লেন থেকে খুব একটা নিচে মনে হচ্ছিল না। উপরে ঝলমলে আকাশ আর নিচে তুষারশুভ্র মেঘের স্তর। আমাদের প্লেন ধীরে ধীরে মেঘের রাজ্যে ডুব দিল। পাইলটের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো যে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা সুইডেনের 'আরলান্ডা' বিমান বন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছি।

একটু পরেই ভূপৃষ্ঠের গাছ-পালা, ক্ষেত-খামার, রাস্তা-ঘাট নজরে এলো। দেখলাম যে চারদিকে স্থানে স্থানেই বরফ জমে আছে। মনে হলো যে ব্যাপকভাবে বরফ পড়া তখনও শুরু হয়নি বেলা সাড়ে এগারটায় আমরা অবতরণ করলাম। বাইরে উত্তাপ তখন (-) ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

বিমান বন্দরে আমার শ্যালক জনাব এস এ হাসেম ও তাঁর এক বন্ধু আমাদের নিতে এসেছেন। আমরা ৪৫ কিলোমিটার দূরে স্টেনটাতে অবস্থিত হাসেম সাহেবের বাসভবনে পৌঁছলাম ৪৫ মিনিটের মধ্যেই। স্টেনটা একটা ছোট উপশহর। ঘরে পৌঁছতেই হাসেম সাহেবের স্ত্রী জনাবা সেলিনা বেগম (শেলী) স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, জোহরের সময় শেষ হতে আর মাত্র ২০ মিনিট রয়েছে এবং আমরা যেন নামাজটা পড়েই মধ্যাহ্ন ভোজনে বসে যাই। এখানেই বলে রাখি যে, আমার এই আত্মীয় পরিবারটি অত্যন্ত নামাজী, দেশবিদেশে তবলীগ করে বেড়ান, দ্বীন প্রচারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ধর্ম বিষয়ক বই-পুস্তক নিয়ে রীতিমত গবেষণা করেন। এ ব্যাপারে শেলীর আগ্রহই বেশী ও তাঁকেই উদ্যোক্তা বলা যেতে পারে। মাত্র ১০ বছর পূর্বেই এই শেলী একজন অত্যাধুনিক শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্যে সুইডেনে গিয়েছিলেন। সুইডেনে থাকাকালীন সময়ে বিগত বছরগুলোতে তাঁর মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে চলনে-বলনে, আচার-ব্যবহারে, পোষাকে-আষাকে একজন খাঁটি মুসলমান। নামাজ রোজা-ত করেনই-তার সাথে দোয়া-দরূদ এবং সমস্ত ধর্মীয় আনুষঙ্গিক করণীয় ও বর্জনীয় রীতি-নীতি পালনেও কোন শৈথিল্য নেই। হাসেম সাহেব এবং মেয়ে দুটিও (রীতা ও সেগুপ্তা) সুইডেনের মত দেশে থেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমান বনে গেছেন। আমরা জোহরের নামাজ আদায় করে একটু পরেই বেলা একটার সময় আছরের নামাজ শেষ করে দুপুরের খানা খেতে বসলাম। যে কদিন স্টকহল্‌মে ছিলাম প্রতিটি বেলাতেই শেলী রীতিমত ভোজের ব্যবস্থা করেছেন।

www.pathagar.com

বর্তমানে স্টকহল্‌মে সকাল হয় ৯ টায়, জোহর হয় বেলা ১১ টায়, আসর হয় বেলা ১ টায় এবং মগরেব হয় সন্ধ্যা ৩ টায়। মাত্র ৬ ঘন্টা দিন এবং ১৮ ঘণ্টা রাত। এদেশে দিনের মাপে নামাজ রুটিন হলেও কাজের রুটিন হয় ঘড়ির কাঁটা ধরে। সকালে যখন ৭ টায় নাস্তা করে অফিসের দিকে ছোটে তখন ভোর রাত। ৮ টায় যখন অফিসে পৌঁছে, তখনও ফজরের ওয়াক্ত হয়নি। যখন দুপুরের খাবার খায় তখন সূর্যের আলো দিগন্তে এতটা হেলেছে যে মনে হয় এই বুঝি সন্ধ্যা হয়ে এলো। আর বিকেল ৬ টায় যখন অফিস ছুটি হয় তখন মনে হয় যেন রাতের এক দেড় প্রহর শেষ হয়ে গেছে। রাতের খাবার সময় মনে হয় যেন দুপুর রাতে খেতে বসেছি। এটা ত হলো স্টকহল্‌মের অবস্থা।

আরও উত্তরে যদি যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, শীতকালে দিনের আলো দুই এক ঘণ্টার জন্যে পাওয়া যাচ্ছে। আর সর্ব উত্তরে রাতের আঁধার শেষে সকালের আলো ফুটবার আগেই আবারও রাতের আঁধার নেমে আসে। দিনটা শুধু মাত্র ক্ষণিকের জন্যে দিগন্তে আলোর আভাসের মধ্য দিয়েই শেষ হয়। এই স্বল্প সময়টুকু ধূপ-ছায়ার মতই মনে হয়। পূর্বাকাশ রঙিন হয়ে ওঠে এবং আলোর ছটা মিলিয়ে যাবার পূর্বেই পশ্চিম আকাশ হয়ে ওঠে রক্তরাগ। মেরু অঞ্চলে ভূগোলকের চুম্বকত্ব ও সৌররশ্মির প্রভাবে এই আলো আরও রঙিন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মনে হয় নানা বর্ণের আলো বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে ও ছড়িয়ে পড়ছে। এই আলোর মেলা ও খেলাই অরোরা 'Aurora' নামে পরিচিত এবং সাধারণত ৬০ ডিগ্রী অক্ষাংশের উপরই পরিলক্ষিত হয়।

এ সব অঞ্চলে যেখানে শীতকালে একটি দিনের সকাল-সন্ধ্যা অর্থাৎ সূর্যের উদয় ও অস্ত যাবার সময়েয় ব্যবধান মাত্র কিছুক্ষণের এবং তাও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা মুশকিল, সেখানে ফজর থেকে মাগরেব পর্যন্ত দিনের ৪ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তাই ঐ সব অঞ্চলের মুসলমানগণ দক্ষিণাঞ্চলের কোন বড় শহর যেখানে মসজিদ আছে তাদের সময় অনুযায়ী নিজেদের নামাজের সময় বেঁধে নেয়। এতে যুক্তি আছে এবং এই যুক্তির প্রয়োগ যদি বিশ্ব মুসলিম আলেম সমাজ ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী ঘটান তাহলে উত্তর গোলার্ধে নির্ধারিত অক্ষাংশের উপরে নামাজ ও রোজার নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিতে পারেন। অনুরূপভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের দক্ষিণ অংশেও ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী নামাজ-রোজার সময় ঠিক করা যেতে পারে। এ ভাবে সূরা ইনশিরাহ-এর ৫ ও ৬ আয়াতসমূহ এবং সূরা আল বাকারার ১৮৫ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক দ্বীনকে অনুসরণ করা সহজতর করা হবে।

আগেই বলেছি যে সুইডেন হচ্ছে হ্রদের দেশ। ৩৫০০০০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই দেশে সর্বমোট ৯৬০০০ Lake অর্থাৎ হ্রদ রয়েছে। তাই এই দেশকে হ্রদের দেশও বলা যেতে পারে স্টকহল্‌ম শহরটিও ১৪ টি দ্বীপের সমন্বয়ে

www.pathagar.com

গঠিত। 'মেলারেন হ্রদ' এবং আশে পাশে সাগরের ছোট ছোট শাখা-প্রশাখায় এই দ্বীপসমূহ অবস্থিত এবং এই দ্বীপসমূহকে প্রায় ৫০ টি সেতু দ্বারা সংযোজিত করে এক ভূখণ্ড তৈরি করা হয়েছে। স্থল ও জলের এমন সুন্দর ও সুষম সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। প্রত্যেক বাড়ীর জানালা থেকেই দেখা যাবে নীল মায়াবী হ্রদ, যেখানে বন্য হাঁস ও পাখীরা উড়ে বেড়াচ্ছে নির্ভয়ে, যেখানে সুউচ্চ পাহাড় পানির সাথে জলকেলিতে মত্ত, যেখানে উদার আকাশে ভ্রাম্যমাণ মেঘ বনের ছায়া নিয়ে নীলজলে লুকোচুরি খেলছে।

এ সব দিক থেকে বিচার করে স্টকহল্মকে ভূস্বর্গ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। সুইডেনবাসীরাও নিজেদের দেশকে সাজিয়েও রেখেছে অনুরূপভাবে।

।।২।।

সমাজ-চিত্র

হাসেম সাহেবের বাড়ীটা বেশ ছিমছাম। হাসেম গৃহিণীর সযত্নে লালিত কিছু পাটের গাছপালা ড্রইংরুমের শোভাই শুধু বৃদ্ধি করেনি বরং বেশ একটা আন্তরিক পরিবেশও সৃষ্টি করেছে।

হাসেম সাহেব সরকারী বরাদ্দ পেয়েই মাসিক ভাড়াতে মোটামুটি স্থায়ীভাবে এই বাড়ীতে থাকছেন। বরাদ্দকৃত বাড়ী থেকে কাউকে সরানো যায় না যদি না ভাড়াটে অধিকার ছেড়ে দেন। দখলকারী যদি ভাড়া না দিতে পারে তা হলে সরকার ভাড়া দেবে তবু এই দেশের প্রথামত কাউকে উৎখাত করা যাবে না। সুইডেনে কেউ গৃহহীন থাকতে পারবে না। প্রত্যেকেরই ঘর থাকবে (মাথা গোঁজবার ঠাঁই নয়) প্রকৃত অর্থেই দুই কামরা বিশিষ্ট ঘর, যেখানে ইলেকট্রিসিটি ও গ্যাস সংযোজন থাকবে। ছেলে মেয়েদের বড় হলে আলাদা ঘরের জন্যে সরকারের নিকট আবেদন করবে এবং আবেদনপত্র সরকারের বিবেচনায় থাকবে এবং যথাসময়ে বাড়ী বরাদ্দ দেয়া হবে-ভাড়া প্রদানের সামর্থ্য থাকুক কিংবা নাই থাকুক। যতদিন ভাড়া প্রদানের সামর্থ্য না থাকবে ততদিন সরকার ভাড়া পরিশোধ করতে থাকবে।

অন্যভাবে বললে বলতে হয় যে, সুইডেনে প্রত্যেক নাগরিকেরই বেঁচে থাকার অধিকার সরকার দিয়েছে এবং তার থাকার, খাবার, চিকিৎসার ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার এবং অন্যান্য বিনোদন খরচ বাবদ সরকার বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে থাকে।

আরও একটু খোলাসা করে বললে বলতে হয় যে, একজন বেকারের যদি কর্মক্ষমতা না থাকে কিংবা কোন চাকরি না থাকে তাহলে তাকে সরকার ২০০০ ক্রোনার মাসিক ভাতা হিসেবে দেবে। যেহেতু তার বাড়ী ভাড়া দেবার সংগতি নেই

www.pathagar.com

সেহেতু সে আগে যে বাড়ীতে থাকতো সেই বাড়ীটির ভাড়া সরকার পরিশোধ করবে। ইলেকট্রিসিটি ও গ্যাস বিল যদি ভাড়ার সাথে শামিল না থাকে তাহলে সরকার মাসিক ৪০০ ক্রোনার দেবে। বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মাসিক ৩০০ ক্রোনার দেয়া হবে। স্বাস্থ্য ও ওষুধপত্র বাবদ ২০০ ক্রোনার এবং যাতায়াত ও অন্যান্য বিনোদনমূলক খরচ বাবদ মাসিক ৪০০ ক্রোনার দেয়া হবে। এ ভাবে দেখা যাবে যে, যদি একজন বেকার ৪০০০ ক্রোনারের বাড়ীতে থাকে তাহলে সে বেকার ভাতা পাবে মাসিক ৭৩০০ ক্রোনার যা বর্তমান বাংলাদেশী টাকার মূল্যমানে দাঁড়াবে প্রায় ৫৫০০০ টাকা। এ থেকেই সুধী পাঠক সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, সুইডেন সামাজিক বিবর্তনের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সেখানে না খেয়ে কিংবা শীত/গ্রীষ্মে খোলা আকাশের নিচে গৃহহীন অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় মরে যাবার সম্ভাবনা নেই। বেকারটি যদি বিবাহিত হয় ও তার পোষ্য থাকে তা হলেও সরকার প্রত্যেকের জন্যে বিশেষ ভাতা প্রদান করে থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, যদি চাকরি না করেই মাসিক প্রায় ৭৫০০ ক্রোনার পায় তাহলে কোন দুঃখে সে কাজ করতে যাবে? এর জবাব হচ্ছে যে, সরকার তাকে যে কোন চাকরি দিতে পারে এবং তাকে সেটা করতে হবে কিংবা সরকার তাকে শিক্ষার্থী হিসেবে কাজে লাগাতে পারে এবং তাকে তাই করতে হবে। এখানে কোন বাহানা চলবে না এবং কাজে ফাঁকি দেয়া চলবে না। তাছাড়া উপার্জন যারা করে তাদের বিশেষ মর্যাদা আছে এবং তারা ন্যূনতম ভাতা থেকে বেশী টাকাই পেয়ে থাকে। মনে করা যাক, ৭৫০০ ক্রোনার যে ব্যক্তিটি বেকার ভাতা পান তিনি যদি চাকরিতে যান তা হলে তিনি কমপক্ষে ১২০০০ ক্রোনার পাবেন এবং ট্যাক্স বাদ দিলে প্রায় ১০০০০ ক্রোনার হাতে থাকবে যা পূর্ববর্তী ৭৫০০ ক্রোনার থেকে অনেকখানি বেশী। এতে তাঁর সামাজিক মর্যাদা এবং স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। তাই তিনি কাজ পাবার প্রতি ও করার প্রতি আকৃষ্ট হবেন। যে ট্যাক্স কেটে রাখা হল তার হিসেব সরকারের নিকট থাকবে এবং পরবর্তী কালে এই ব্যক্তিটি যখন পেনশনভোগী হবেন তখন এই ট্যাক্সের একটা অংশ বাড়তি আয় হিসেবে তার প্রাপ্য হবে। সুতরাং তখনও তিনি লাভবান হবেন।

হাসেম সাহেব যে বাড়ীটিতে থাকেন তা বেশ সুন্দর এবং আয়তন প্রায় ১০০০ বর্গ ফিট। মাসিক ভাড়া ৫০০০ ক্রোনার অর্থাৎ ৩৫০০০ টাকার মত। এই ভাড়ার মধ্যে ইলেকট্রিসিটি ও গ্যাস বিল শামিল নেই। কোন কোন অঞ্চলে বাড়ী ভাড়ার মধ্যেই বিলসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে তখন ভাড়াটেকে শুধু বাড়ী ভাড়া দিলেই চলে। এলাকা বিশেষে এই বৈষম্য কেন? এর উত্তরে হাসেম সাহেব জানালেন যে, এখানকার বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল নিজ নিজ এলাকায় সুযোগ-সুবিধা কম-বেশী করার এক্তিয়ার রাখে। যদি খাস সুইডেন-বাসীদের এলাকা হয় তাহলে

www.pathagar.com

তাদের জন্যে সুযোগ-সুবিধা বেশী থাকে। স্টেনটা এলাকাতে বহিরাগতই বেশী, তাই এ এলাকাতে ভাড়াটিয়াকে বিলসমূহ ভাড়ার অতিরিক্ত হিসেবে পরিশোধ করতে হয়।

সুইডেনের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আরও আলোচনা করব তবে বর্তমানে সদ্য আগত বাংলাদেশী হিসেবে সুইডেনের পথে-ঘাটের অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে ধরা যাক।

যখনই বিদেশে যাই এবং দেশের ও বিদেশের পরিস্থিতির তুলনামূলক চিত্র মনে আঁকি তখনই মনটা বেদনায় ভরে ওঠে। বাংলাদেশের ভীড় ঠেলে একটু খোলামেলা জায়গায় এসে জনসমুদ্রের চাপ থেকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও রেহাই পাওয়াতে আনন্দ আছে, আবার আমাদের দেশের দুর্দশার কথা মনে হলে ব্যথায় মনটা টনটন করে ওঠে। নিরিবিলি বলে আমাদের দেশে কিছু নেই। আমাদের কৃষ্টিও এমন যে কাউকে নিরিবিলিতে থাকতে দেয়া হয় না। কালেভদ্রে যদি কখনও শহরে কোন পার্কের কোণে একটু নিরিবিলি স্থান পান তাহলে কয়েক মূহূর্তের মধ্যেই কি এক দঙ্গল ভিখারী আপনাকে ছেঁকে ধরবে না? আপনাকে কি দু'দণ্ড শান্তিতে থাকতে দেবে? অথচ আমাদের থেকে ৮ গুণ ঘন বসতিপূর্ণ দেশ সিঙ্গাপুরে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থাপনা এবং সুচিন্তিত নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, লোকে পার্কে নিরুপদ্রবে অবসর বিনোদন করতে পারে, নিশ্চিন্তে রাস্তার পাশে বসে থাকতে পারে এবং নির্ভাবনায় কিছুটা সময় কাটাতে পারে। সবুজ বনানী দেখে চোখ জুড়াতে পারে। জাপান, কোরিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে জন-সংখ্যার ঘনত্ব আমাদের দেশের মতই। তারা সুপরিকল্পিত আবাসভূমি স্থাপনের এবং সুষ্ঠু-ভাবে ভূমি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের গৃহায়ন সমস্যা, কৃষি ও শিল্প স্থাপনের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করেছে এবং সাফল্য লাভ করেছে। লন্ডন শহরের কথাই ধরা যাক। ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক ২০০০ বর্গমাইলে বসবাস করছে অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ৬০০০ লোক। এখানেও শহরের মাঝে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সবুজ বিচরণভূমি, অসংখ্য ছোট-বড় পার্ক, সরোবর, বাগান, খেলাধূলোর মাঠ, প্রমোদোদ্যান, বনভূমি ইত্যাদি। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও তার সঠিক বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে তারা তাদের সমস্যার সমাধান করেছে। দুঃখ হয় ভাবতে যে, আমরা শুধু আমাদের দৈন্যের দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে, হাত-পা গুটিয়ে বসে হা হুতাশ করছি এবং আমাদের দুর্দশার জন্যে প্রকৃতি ও বিধাতাকে দোষারোপ করছি।

স্টকহল্‌মে ফিরে যাই। একদিন ছোট একটা বাস স্টপেজে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছি। ৯ মিনিট পর বাস আসবে বলে লেখা আছে। এক ভদ্রমহিলা এলেন। তার সাথে আছে প্যারামবুলেটর (বাচ্চা বহনকারী ঠেলা গাড়ী) এবং আরো

www.pathagar.com

দুটি ছেলে-মেয়ে বয়স ৪ ও ৬ হবে। এ সব ছোট বাস স্টপেজগুলো খুবই সাধারণ ভাবে রাস্তার ধারে নির্মিত হয়ে থাকে। তিন দিকেই কাঁচ দিয়ে ঘেরা এবং ৮ ফিট উঁচুতে প্লাস্টিক কিংবা ফাইবার গ্লাসের ছাদ। ঘরটির এক পাশ দিয়ে আগমন ও নির্গমনের জন্যে খোলা পথ। সমস্ত ঘরটি ৮ কি ১০ ফিট লম্বা এবং ৫ ফিটের মত প্রশস্ত হবে। পেছনের দিকে একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চ। ক্ষণিকের জন্যে এই ধরনের আশ্রয় খুবই সুবিধাজনক। সাধারণত যারা প্রতিবন্ধী, শিশু এবং সিনিয়র সিটিজেন অর্থাৎ বয়স ৬৫-এর উপর তারাই এখানে কিছুক্ষণের জন্যে শীতের হাওয়া, বরফ ও বৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার জন্যে আশ্রয় নেয়। এই ছাউনির ঠিক বাইরেই ময়লা ফেলার বাক্স রক্ষিত আছে। দেখলাম ছোট মেয়েটি একটা টফির মোড়ক খুলে টফিটি মুখে পুরলো এবং মোড়কটি নিচে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে মা সতর্ক করে দিতেই ৪ বছরের ছোট মেয়েটি কাগজটি কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে ময়লা ফেলার বাক্সে ফেলে দিয়ে এলো।

টুকিটাকি কাগজ ও জঞ্জাল আমরা বয়স্করাই আমাদের দেশে এখানে ওখানে ফেলি এবং পরিবেশ দূষিত করি। এগুলোকে আমরা যদি প্রথম থেকেই সঠিকভাবে জঞ্জাল বাক্সে ফেলতাম তাহলে রাস্তা-ঘাট এমনিতেই পরিষ্কার থাকতো।

একটা ছোট ঘটনা মনে পড়ে গেল। প্রাক্তন মন্ত্রী মাইদুল ইসলাম, মন্ত্রী হবার পূর্বে ১৯৭৫ সনে আমার অফিসে একদিন এলেন। আমি তখন বি-আই-ডব্লিউ-টি-সির চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। তিনি উত্তর বঙ্গের সাথে পূর্ববঙ্গের সড়ক যোগাযোগ আরও সহজ করার জন্যে ভূয়াপুর-সিরাজগঞ্জে যমুনা নদী পারাপারের জন্যে একটা সি-ট্রাক সার্ভিস চালু করার অনুরোধ জানালেন। আমি প্রস্তাবটির সবদিক বিবেচনা করে ও সরজমিনে সার্ভে করে সার্ভিসটি চালু করেছিলাম।

চেয়ারম্যান হিসেবে একদিন পর্যবেক্ষণ করতে যেয়ে দেখি যে, এক ভদ্রলোক ও তার ছোট দুটো কন্যা চিনাবাদাম খাচ্ছে এবং খোসা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলছে। এ বিষয়ে ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বললেন যে, জাহাজে ঝাড়ুদার আছে তারাই পরিষ্কার করবে।

এই হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। উন্নত দেশসমূহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার একটা কৃষ্টি গড়ে উঠেছে। তারা সচেতন নাগরিক তাই তাদের দেশকে সদা পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করে। তাই তাদের রাস্তাঘাট আবর্জনামুক্ত থাকে। পরিষ্কার থাকাটা কৃষ্টির অঙ্গ হিসেবে তারা গ্রহণ করেছে। আমাদের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ মেনে নিয়ে ধর্মীয় কিতাবে সীমাবদ্ধ রাখেনি।

এই কথার অবতারণা এই জন্যে করলাম যে, দেশের মান উন্নত করতে হলে, নাগরিকদের সচেতনতা ও মূল্যবোধকে বাড়াতে হবেই এবং তার জন্যে জাতীয় প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার একান্ত ভাবেই প্রয়োজন হবে। টেলিভিশনে একটা

www.pathagar.com

কমার্শিয়াল চ্যানেল খোলা যেতে পারে যার আয় হবে কমার্শিয়াল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এবং নাগরিক শিক্ষা বিস্তারের জন্যে সরকারী অনুদান। Distant Education (দূর শিক্ষণ) কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রাথমিক পদক্ষেপ সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে।

সুইডেনবাসীরা একটি উন্নত দেশের গর্বিত নাগরিক এবং উন্নততর জীবন ধারণের জন্যে সদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুইডেনের নীতি হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্বিবাদ থাকা, কোন প্রকার সামরিক চুক্তি কিংবা ঝগড়া-ফ্যাসাদে জড়িয়ে না পরা এবং সকলের সাথেই বন্ধুত্ব বজায় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলা। এই নীতির অনুসারী হিসেবে তারা গত দুই মহাযুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল এবং গত প্রায় ১৫০ বছরে কোথাও কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। শান্তিপূর্ণভাবে তারা ইউরোপে মাথা উঁচু করে এক অনন্য আসনে বসে আছে।

।।৩।।

সুড়ঙ্গ রেলপথ

বাল্টিক সাগরের পশ্চিম ধারে অবস্থিত সুইডেন দেশটি পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর দেশ। এ দেশেরই 'গামলাস্টান' নামক একটা ছোট দ্বীপে প্রথম জনপদ গড়ে ওঠে ১২৫২ খৃস্টাব্দে। তারপর দীর্ঘ ৪০০ বছর ধরে ধীরে ধীরে এর আশে পাশে ১৪টি দ্বীপে জনপদের বিস্তৃতি ঘটে এবং ১৬৩৪ খৃস্টাব্দে শহরটি সুইডেন দেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে এবং এর নাম হয় স্টকহল্‌ম। সুইডেনের ঔপন্যাসিক 'সেলমা লাগেরলোফ'-এর বর্ণনায় রাজধানী স্টকহল্‌ম একটা ভাসমান শহর। এ শহরের ১৪টি দ্বীপকে পরস্পরের সাথে আধুনিক ও প্রশস্ত সেতু দ্বারা সুন্দরভাবে সংযোজিত করা হয়েছে। পর্বতঘেরা সামুদ্রিক খাঁড়িতে ছোট ছোট দ্বীপসমূহ এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে গুচ্ছ বেঁধে রয়েছে যে, মনে হয় এক অখণ্ড ভূমি। দ্বীপসমূহের মধ্যবর্তী সাগরের নীল স্বচ্ছ জল মনে হয় নদীর মত এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হচ্ছে। আকাশ থেকে দেখলে মনেই হয় না যে, এটা একটা দ্বীপসর্বস্ব শহর। বনভূমি ঘেরা পাহাড়, কঠিন শিলা, খাদ ও হ্রদ এবং শীতকালীন শুভ্র বরফের আচ্ছাদন এই শহরটিকে মোহময় করে তুলেছে। মনে হয় এখানে হারিয়ে যাই।

৪ ডিসেম্বর বুধবার আমরা স্টকহল্‌ম শহরটি ঘুরে দেখার জন্যে বের হলাম। টেনস্টা থেকে ১২/১৪ মাইল দক্ষিণ পূর্বে টি-সেন্ট্রালেন হচ্ছে ভূনিম্ন রেলপথের সুইডিশ ভাষায় টুনেলবানানের (Tunnel Bannan) কেন্দ্রস্থল। এই স্টেশন থেকে

www.pathagar.com

দ্রুতগামী আন্তর্দেশীয় রেলগাড়ীও ছাড়ে। সে হিসেবে এটা ভূপৃষ্ঠের রেলগাড়ীরও কেন্দ্রীয় স্টেশন।

স্টকহল্‌মের ভূনিম্ন রেলপথ (টুনেলবানান) দেখবার মত। তিনটি লাইনে শহর ও বৃহত্তর শহরের বিভিন্ন স্থানের সাথে প্রায় ১৫০ টি স্টেশনের মাধ্যমে দিনরাত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। এখানকার বৈশিষ্ট্য যে, ট্রেনসমূহ কাঁটায় কাঁটায় সময়মত চলে। সুইডেন হচ্ছে কঠিন শিলার দেশ। এখানে ভূনিম্নে সুড়ঙ্গ তৈরি করাটা খুবই ব্যয় ও শ্রমসাপেক্ষ। তবে সুইডেনের কৃতি সন্তান আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল (১৮৩৩-৯৬); ১৮৬৭ সনে ডায়নামাইট আবিষ্কার করেন যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিতভাবে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কঠিন শিলা চূর্ণ করা যায়। এই ডায়নামাইটের সাহায্যে সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করেছে সুইডেন। প্রত্যেকটি সুড়ঙ্গ পথই বেশ প্রশস্ত এবং অনেক জায়গায় স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটি স্টেশনের একটা বিশেষত্ব আছে। বিভিন্ন স্টেশনে চিত্রকলার সমারোহ এমনভাবে ঘটানো হয়েছে যে, সুইডেনের টুনেলবানানকে পৃথিবীর দীর্ঘতম চিত্রশালা বলে অভিহিত করা হয়। লক্ষ লক্ষ যাত্রী প্রতিদিন টুনেলবাননে ব্যবহার করছে এবং বিভিন্ন স্টেশনের বিভিন্ন চিত্র ও দেয়াল লিখন, চিত্র ফলক, প্রতিমূর্তি, বিমূর্ত শিল্পকলা, বিভিন্ন রঙের বাহার উপভোগ করছে। কিভাবে এই সম্ভার গড়ে উঠল তা জানার আগ্রহ নিশ্চয়ই মনে উদয় হয়, কিন্তু এ সম্বন্ধে সাধারণ সুইডেনবাসীরাও বিশেষ কিছু জানে না। তাই এর ইতিহাস দেয়া সমীচীন মনে করছি।

কুংগস্ট্রাটগার্ডেন ভূনিম্ন ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে লেখক ও তাঁর পত্নী

www.pathagar.com

১৯৪০ সনে যখন সর্বপ্রথম ভূনিম্ন রেল লাইন স্থাপিত হয় তখনই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, প্রতিটি স্টেশনকে এমনভাবে সাজাতে হবে যে, এ দেশের কৃষ্টি, কলা ও সভ্যতার প্রতিফলন যেন ঘটে। ১৯৫৫ সনে স্টকহল্‌ম সিটি করপোরেশন এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, প্রতিটি স্টেশনকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে এবং এর জন্যে সুইডেনের চিত্রশিল্পী, কারুশিল্পী, ভাস্কর, মৃৎশিল্পী, এবং সুকুমার শিল্প চর্চাকারী এবং উৎকৃষ্ট কারিগরদের সুযোগ দেয়া হবে যাতে সিটি করপোরেশন গৃহীত ধ্যান-ধারণাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। শুরু হয় কাজ ও তারই জন্যে আজ প্রায় ১৫০ টি স্টেশনের মধ্যে ৭০ টিরও অধিক স্টেশনের মেঝে, ছাদ, ও দেয়াল সুন্দরভাবে সাজানো সম্ভব হয়েছে। প্রতি বছরই নিত্য-নতুন আঙ্গিকে আরও কিছু সংযোজন করা হচ্ছে। বর্তমানে শুধু রঙ চিত্রই নয়, মোজায়েক চিত্র, বিভিন্ন বাণী যথা-শান্তি চাই, ভ্রাতৃত্ব-বন্ধুত্ব গড়ে উঠুক ইত্যাদি দেয়াল লিখন, খোদাই কাজ, স্টেশনের ভেতরে সুশ্যামল বাগিচা, জলপদ্ম বাগান এবং অতি আকর্ষণীয় গুহা তৈরি করে রাখা হয়েছে। এই কার্যক্রমে প্রায় ১২৫ জন খ্যাতনামা বিভিন্ন ধরনের শিল্পী স্টকহল্‌মের টুনেলবানানকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এখনও প্রতি বছর এই ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথকে আরও চিত্তাকর্ষণীয় করে তুলছে।

প্রথম যখন ১৯৯২ সনে স্টকহল্‌মে এসেছিলাম তখন এই শিল্প প্রদর্শনী শুধু ভাল লেগেছিল কিন্তু এর ইতিহাস জানতাম না বলে আগ্রহ নিয়ে দেখিনি। এবারে পর্যটকসুলভ মন নিয়ে দেখলাম।

টেনস্টা স্টেশনের আকর্ষণ হচ্ছে 'বহিরাগতদের জন্যে একটি গোলাপ' এই মর্মার্থ ফুটিয়ে তোলার জন্যে ফুলের ছবি, বহিরাগতদের জগতের উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর আঁকা ছবি এবং উদ্ধৃতি দিয়ে স্টেশনটিকে সাজানো হয়েছে। টি সেন্ট্রালেন-এও বহু নামকরা চিত্রশিল্পীদের ছবি রয়েছে। ১৯৫৭ সনে অঙ্কিত ব্যান্ডস্‌বার্গের অলঙ্করণ (Decoration) থেকে শুরু করে ১৯৯৪ সনে ইওরগেন ফজিলকিস্ট-এর সিরামিক টাইল দ্বারা শোভাবর্ধন এই স্টেশনটিকে চিত্রপুরীতে রূপান্তরিত করেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মাঝেও কখনও কখনও কিছু শিল্পী তার অবদান রেখে গেছে।

এ ভাবেই নানা স্টেশনে কোথাও বন্ধুত্ব-ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির জন্যে উদ্ধৃতি, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে আহ্বান, গূঢ় অর্থবাহক রেখাচিত্র (Abstruct paintings), কাঠে খচিত প্রতীক, মোজায়েক দ্বারা চিত্রিত নানা ছবির মাধ্যমে কলা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং সমাজ ও সংসারের বিবর্তন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিভিন্ন স্টেশনে শত শত শিল্পকর্মের ধারণা বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রিংকেবি স্টেশনে আছে ভাইকিং যুগের বৈশিষ্ট্য-আশা-ভরসার প্রতীক সূর্য এবং প্রতিরক্ষার জন্যে শক্ত খুঁটির

www.pathagar.com

বেড়া। মাসমো স্টেশনে আছে ইস্পাতের পাত দিয়ে আচ্ছিত সূর্যটাকে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা। হুলস্টা স্টেশনে রয়েছে প্রকৃতি, শহর ও মানুষ কিভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে সহ-অবস্থান করছে তার চিত্র। রিস্‌নি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পাথর কেটে মেঝেতে একটা অতি সুন্দর বাণী লেখা আছে 'TODAY IS THE FIRST DAY OF THE REST OF YOUR LIFE' অর্থাৎ আজ হচ্ছে আপনার বাকী জীবনের প্রথম দিন। এ ভাবে বিভিন্ন স্টেশনে বিভিন্ন তথ্যের সমাহার ঘটানো হয়েছে যা নিয়ে অধিক আলোচনা করে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। শুধু এটুকু নিবেদন করছি যে, সুইডেনবাসীরা তাদের দেশকে এক অভিনব পন্থায় বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরতে চাইছে। আমাদের দেশেরও আছে গৌরবময় অতীত, আছে সোনালী ভবিষ্যত যার সুফল পেতে হলে বর্তমানের ঝগড়া-ফ্যাসাদ ভুলে আমাদের মাথা উঁচু করে এগুতে হবে।

স্টকহল্‌মের টুনেলবানানের সুড়ঙ্গ পথ লন্ডনের আন্ডার গ্রাউন্ড সুড়ঙ্গপথের মত ছোট ছোট নয়। এগুলো অনেক প্রশস্ত। এখানকার সুড়ঙ্গপথকে সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষণের জন্যে বাইরের বাহ্যিক কাঠামোর ব্যবহার যতটা কম পারা যায় তাই করা হয়েছে। এতে স্বাভাবিক পাথরের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়নি বরং ফুটে উঠেছে। আলফ্রেড নোবেলের ডায়নামাইট এখানে মানব কল্যাণে উত্তমরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশস্ত টুনেল বানানের সুড়ঙ্গ পথের ষ্টেশনের সুশোভিত ছাদ

www.pathagar.com

আমরা স্টাডহাগান স্টেশনে এলাম। হাশেম সাহেব জানালেন যে, এই স্টেশনের উপর অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে স্টকহল্‌মের সর্ববৃহৎ শিশু হাসপাতালটি অবস্থিত। এখানেই তাদের মেয়ে রীতা ও সেগুপ্তার থেলাসিমিয়ার চিকিৎসা হয়েছিল। সুইডেন হচ্ছে সমাজ কল্যাণমুখী একটি রাষ্ট্র এবং এখানে বাচ্চাদের সর্বপ্রকার চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হয়। সমাজ কল্যাণনীতি বাস্তবায়নের জন্যে বেকার ভাতা কি প্রকার দেয়া হয় তার বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে দিয়েছি। চিকিৎসার জন্যে প্রতি মাসে ২০০ ক্রোনার দেয়া হয়। তারপরও যদি গুরুতর অসুখ হয় তাহলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া যায় এবং তখন চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে হয়ে থাকে। রীতা ও সেগুপ্তার দীর্ঘ চিকিৎসার খরচাদি পুরোটাই সুইডেনের সরকার বহন করেছে। মানব অধিকার তত্ত্ব পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্যে এরা শুধু সুইডেনের নাগরিকদের নয় বরং ন্যায্যভাবে সুইডেনে অবস্থানরত যে কোন দেশীয় বহিরাগতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে ও ব্যয়ভার বহন করে।

শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মাতৃত্ব ছুটি (ম্যাটারনিটি লীভ) এখানে ২ বছর। এই ছুটি শুধু বাচ্চাকে দেখাশুনা করার জন্যেই দেয়া হয়ে থাকে। এই ছুটি বাবা কিংবা মা দুজনের একজন যে কোন সময় নিতে পারে। মাতৃত্ব ছুটি বাবা কিভাবে নেয় তার জবাবে হাশেম সাহেব জানালেন যে, এখানে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই সাধারণত কর্মজীবী। সুতরাং যে কোন একজনের দীর্ঘদিন কাজে অনুপস্থিতি তার চাকরি জীবনের রেকর্ড খারাপ করে দিতে পারে। তাই ভাগ করে ছুটি নেয়ার ব্যবস্থা। স্বামীরা ছোট ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করতে পারবে কিনা এর উত্তরে হাশেম সাহেব জানালেন যে, এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় ছোট ছেলেমেয়েদের কিভাবে দেখাশুনা করতে হয় তা স্কুলেই শিখিয়ে দেয়া হয়। পাক করা ও ঘর রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় কাজ, ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলেই শেখান হয়। তাই বাবারা গর্ভধারণ করা ও বুকের দুধ খাওয়ানো ছাড়া আর সকল কাজই করতে পারে। তাছাড়া বাচ্চাতো দুজনেরই তাই পুরুষকে অবশ্যই বাচ্চার লালন-পালন করতে হবে এটাই এ দেশের চিন্তাধারা। মাতৃত্ব ছুটি পূর্ণ বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সহই ভোগ করা যায়।

সুইডেনের জনসংখ্যা মাত্র ৯০ লক্ষ। এত বড় দেশ (ইউরোপের ৪র্থ বৃহত্তম দেশ) অথচ এত কম লোকসংখ্যা। তাই সুইডেন সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে নানাভাবে উৎসাহ যোগায়। ৪ জন ছেলেমেয়ের অধিক হলে সরকার বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করে থাকে। জনসংখ্যা বাড়ানোর এত উদ্যোগ নেয়ার পরও এখানকার জনসংখ্যা দিন দিনই কমে যাচ্ছে। অন্যান্য ইউরোপীয় শিল্পোন্নত দেশসমূহের জনসংখ্যা স্থিতিশীল কিন্তু সুইডেনে নিম্নমুখী কেন? এর সদুত্তর নেই। তবে মনে হয় সমকামিতা একটা কারণ হতে পারে। পুরুষে পুরুষে বিয়ে ও যৌনসম্ভোগ এবং

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে নারীতে নারীতে বিয়ে এবং বিয়ে ছাড়াও অপ্রাকৃতিক যৌন মিলন ও উপভোগ করার প্রচেষ্টা বাচ্চা হবার পথে বিরাট অন্তরায়।

বিয়ে করা ছাড়াই এ দেশে একজন পুরুষ ও একজন নারী একই বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বাস করতে পারে। এরা ভোগের জন্যেই এভাবে থাকে। বাচ্চা এরা চায় না তাই বাচ্চা না হবার সব ব্যবস্থাই এরা নেয়। এদের বাচ্চা হলে সমস্যা একটু হয়। তবে সরকার ভরণ-পোষণ খরচা দেয়। তাই বাপ কি মায়ের একজন ভাতা গ্রহণ করে শিশুটিকে বড় করে তোলে। এভাবে যে শিশুটি জন্ম গ্রহণ করে তার স্বীকৃত জন্মদাতা এরাই হয়, তবে আমাদের দেশের মত ঘনিষ্ঠতা থাকে না। এসব শিশুদের অযত্ন হয় না বটে কেননা সরকার এদের জন্যে অনুদান দিয়ে থাকে, তবে নিবিড় ভালবাসার মধ্য দিয়ে মা-বাবার চোখের মনি হিসেবে বেড়ে ওঠে না।

।। ৪ ।।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি

সুইডেনে ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে তাপমাত্রা সাধারণত হিমাঙ্কের নিচে থাকে। আমরা যে দিন পৌঁছেছিলাম সে দিন তাপমাত্রা ছিল (-) ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং আমাদের থাকাকালীন সময়ে (+) ১ ডিগ্রী থেকে (-৮) ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। সুইডেনের আবহাওয়া আমাদের উপর প্রসন্ন ছিল। যে দিন আমরা সুইডেন ছাড়লাম তার পরদিন থেকেই তাপমাত্রা নামতে শুরু করে এবং ৩ দিনের মধ্যেই (-২৬) ডিগ্রী সেলসিয়াসে পৌঁছে।

আমরা যে কদিন সুইডেনে ছিলাম সে কদিন মোটামুটি আকাশে রোদ পেয়েছি। ২ দিন পেয়েছি ঝলমলে রোদ। তখন কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা পড়ত অত্যধিক। উজ্জ্বল দিনে বাতাস হয় একটু উতলা এবং বাতাসের বেগও বৃদ্ধি পায়। প্রবহমান বাতাসের হিমশীতলতা মনে হতো যেন শরীরে কেটে বসে যাচ্ছে। তখন রাস্তায় চললে মনে হয় নাক ও কান জমে বরফ হয়ে গেছে। কোন প্রকার অনুভূতি থাকে না। তাই নাক, কান, মুখমণ্ডল ও হাত ঢেকেই রাস্তায় বেরুতে হয়। মেঘলা দিনে ও কুয়াশাভরা দিনে শীতের প্রকোপ কম হয় এবং বাতাসের তীব্রতাও কম মনে হয়। সুইডেন আমাদের প্রতি অতি সুপ্রসন্ন ছিল। এমন কোন দিন ছিল না যে আকাশ মুখভার করে ছিল এবং এমন কোন ক্ষণ ছিল না যখন বর্ষা, বাদল, তুষারপাত, ভূমিধস্ কিংবা অন্য কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে কিংবা আমাদের নাজেহাল করেছে।

সুইডেনে প্রচণ্ড শীত হলেই বা কি? ঘুরতে ফিরতে কোন অসুবিধা নেই। বাস, ট্রেন ও অন্যান্য যানবাহনের ভেতরটা গরম করে রাখা হয়। সমস্ত দোকান-পাট,

www.pathagar.com

অফিস-আদালত, বিশ্রামাগার, সমস্ত বাড়ী-ঘর, এমন কি জনসাধারণের জন্যে টয়লেটসমূহও গরম করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এ সবই কেন্দ্রীয় তাপ নিয়ন্ত্রণের আওতায় পড়ে। তাই শীতের প্রকোপ উপলব্ধি করা যায় যখন উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাস্তায় চলাফেরা করা হয়। শীত বেশী লাগলেই কোথাও দোকানে, বিশ্রামাগারে কিংবা স্টেশনে ঢুকে শরীরটাকে একটু গরম করে নিলেই আবার রাস্তায় চলার উপযোগী হয়ে ওঠে। তাই প্রচণ্ড শীতেও আমাদের মত উষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদেরও কোন অসুবিধা হয়নি।

পর্যটক হিসেবে আমরা সাধারণত ট্রামে ও বাসে চড়েই ঘুরেছি। এখানকার ট্রাম, বাস ও ট্রেন এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে রাখা হয় যে, নিজেদের বসবার ঘরের চাইতে কোন অংশে নিম্নমানের মনে হয় না। ভূনিম্ন ট্রেনে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি দ্রুত যাওয়া যায় কিন্তু শহর চেনা হয় না। শহর দেখতে হলে ভূপৃষ্ঠের বাসে করে ভ্রমণ করা উত্তম। আমরা তাই করেছি। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুন্দর। সারা ইউরোপে সময়মাফিক বাস চলার ক্ষেত্রে সুইডেনের নাম সর্বোচ্চে লেখা যেতে পারে। সুইডেনে দেখেছি প্রতিটি ছোট বাস স্টপেজেও বাস চলাচল সময় নির্ধারক চার্ট টাঙ্গানো থাকে কিংবা দেয়ালে সাঁটানো থাকে। রাতে হোক কিংবা দিনেই হোক এ সব ছোট ছোট রাস্তার ধারের বাস স্টপেজেও নির্ধারিত সময়ে কাঁটায় কাঁটায় বাস এসে যায়।

৮৫ ক্রোনার অর্থাৎ প্রায় ৬৩০ টাকা দিয়ে ৫ টা টিকেট কেনা যায় এবং তার প্রত্যেকটিতে দেড় ঘন্টা বাস, টুনেলবানান কিংবা পেন্ডেলটাগেনে (ভূপৃষ্ঠের বৃহত্তর পরিসরে চলাচল করার ট্রেন) করে ঘোরা যায়। প্রতিবারেই ঢুকবার মুহূর্তে টিকেট চেকার সিল মেরে দেয় এবং তাতে সময় পরিষ্কার করে উল্লেখ থাকে। এ সময় থেকে দেড় ঘন্টা পর্যন্ত ভ্রমণ করা যাবে। অন্যায়ভাবে ভ্রমণকারীর সাজা খুবই কঠিন। তবে সময়মত ট্রেনে উঠে যেতে পারলে চলন্ত অবস্থায় দেড় ঘন্টা পার হয়ে গেলেও কোন জরিমানা হবে না। এখানেই বলে রাখি যে, ১০ দিন সুইডেনে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি কিন্তু কোন টিকেট চেকার দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ইটালিতেও একই ব্যবস্থা। সেখানে প্রতিটি বাসে কিংবা টিউব স্টেশনে অর্থাৎ ভূনিম্ন রেল স্টেশনে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র থাকে যাতে টিকেট ঢুকিয়ে দিলে সময়টা ছাপা হয়ে যায়। এ বিচারে আধুনিকতার দিক থেকে ইটালি একটু এগিয়ে আছে। টিকেট ছাড়া ভ্রমণের প্রবণতা এসব দেশে নেই। ১৯৫০ সনে যখন আমি প্রথমবার সুইজারল্যান্ডে যাই তখন গাড়ীতে কিংবা স্টেশনে কোন টিকেট চেকার না দেখে আশ্চর্যই হয়েছিলাম। পাশ্চাত্য জগতের সততার ট্র্যাডিশন এখনও অটুট আছে। আর গত ৫০ বছর ধরেই ফাঁকি দিয়ে ট্রেনে কিংবা বাসে ভ্রমণ করতে পারার জন্যে বিজয়ের আনন্দ কিংবা গর্ব আমাদের দেশে আমরা এখনও উপভোগ করছি।

www.pathagar.com

আমরা পর্যটক হিসেবেই চলাফেরা করছি তাই কিভাবে ভ্রমণ করলে ব্যয় সংকুলাল হয় তার দিকে খেয়াল রেখেই ১০৫ ক্রোনার দিয়ে ৩ দিন মেয়াদী টিকেট কিনলাম। এই টিকেটে ৩ দিন পর্যন্ত যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, যে কোন রুটে বৃহত্তম স্টকহল্‌মে ভ্রমণ করা যায়। তিনদিন মেয়াদী টিকেট আমাদের খুবই সুবিধা হল। তারপর আরও একটু জ্ঞান বাড়ল এবং দেখলাম যে, 'সিনিয়র সিটিজেন' অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক হিসেবে টিকেট কাটলে ১০৫ ক্রোনারের পরিবর্তে মাত্র ৭৫ ক্রোনারেই তিনদিন মেয়াদী টিকেট কেনা সম্ভব। বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক হতে হলে বয়স ৬৫ বছরের উপর হতে হবে। সুইডেন এমন একটা দেশ যেখানে একজন অন্য জনের উপর অগাধ বিশ্বাস রাখে। শুধু বললেই হয় যে, আমাকে একখানা 'সিনিয়র সিটিজেন টিকেট দিন'। কোন প্রকার প্রশ্ন না করেই টিকেট দিয়ে দেবে। সুইডেনে সিনিয়র সিটিজেনদের অনেক সুবিধা আছে। মিউজিয়াম দেখতে যান, কিংবা সিনেমা, থিয়েটার দেখতে যান, দেখবেন সব জায়গাতেই শতকরা ৪০ ভাগ রেয়াত পাচ্ছেন। ইংল্যান্ডেও বহিরাগত 'সিনিয়র সিটিজেন' দের জন্যে রেয়াতের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বৃটিশ সিটিজেনকেও বর্তমানে তাদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে সুবিধা গ্রহণ করতে হয়। তাই আমরা বহিরাগত 'সিনিয়র সিটিজেন'গণ বর্তমানে কোন সুবিধা ভোগ করতে পারি না। সুইডেনে সিনিয়র সিটিজেন মানে বয়স্ক লোকদের ধরা হয় এবং সম্মান দেয়া হয়। এখানে জাতিগত বৈষম্য করা হয় না। এদিক থেকে তারা নিঃসন্দেহে উদারতার পরিচয় দেয়।

সকল দেশের সেরা আমার জন্মভূমি এ বিষয়ে কেউ কোন দিন প্রশ্ন উত্থাপন করতে চায় না এবং করেও না। এটা আমার-আপনার সকলেরই ভাবাবেগপ্রসূত উক্তি। কিন্তু যদি পক্ষপাতহীন ও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা যায় তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, কোন কোন দেশ অন্য দেশ থেকে বিভিন্ন দিক বিচারে যথা শিক্ষায়, শিল্পে, কৃষ্টিতে, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অথবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সেরা।

স্টকহল্‌ম পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর শহর। বর্তমান স্টকহল্‌ম শহরের আদি অংশ হচ্ছে গামলাস্টান এবং এই অংশকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে বৃহৎ স্টকহল্‌ম শহরটি। গামলাস্টানে এখনও প্রাচীন পাথর বসানো সরু আঁকা বাঁকা রাস্তা এবং দু'পাশে মোটা পাথরের দেয়ালে নির্মিত পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বাড়ীঘরসমূহ এই শহরের আভিজাত্যের পরিচয় বহন করে চলেছে। গামলাস্টান থেকে পুল পেরিয়ে কিছুদূর উত্তর-উত্তর পশ্চিমে গেলেই নরমাল্‌ম দ্বীপে চলে আসা যায়। এই নরমাল্‌মেই সারগেলটর্গ অবস্থিত এবং এই অঞ্চলটি বর্তমানে শুধু বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের নয় বরং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ের সম্ভাবনাময় স্থাপত্যশিল্পের

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে। বহুতল রাস্তা সুউচ্চ গ্লাস বসানো অট্টালিকাসমৃদ্ধ এলাকা হচ্ছে নরমাল্‌ম। এই দ্বীপেরই একটু পূর্বে অস্টারমাল্‌ম যা অত্যাধুনিক ফ্যাশনের জন্যে খ্যাত। এখানে বিদেশী দূতাবাসসমূহ অবস্থিত। পূর্বেই বলেছি যে, স্টকহল্‌ম হচ্ছে ১৪ টি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত শহর। সহরের কেন্দ্র থেকে পশ্চিমে কুংস্‌হলমেন দ্বীপে মিউনিসিপ্যাল অফিস এবং স্টাডহুসেট অর্থাৎ সিটি হল্‌ অবস্থিত। মেলারেন হ্রদের তীরে এই হলটি স্বীয় আভিজাত্য নিয়ে দণ্ডায়মান। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে সোডারমাল্‌ম হচ্ছে পর্বতসঙ্কুল একটি বৃহৎ দ্বীপ। স্টকহল্‌ম শহরটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখার জন্যে প্রতি বছর মিউনিসিপ্যালিটি নিজেদের উদ্যোগে ১০ লক্ষ ফুলের গাছ লাগিয়ে থাকে এবং ১৫০ টিরও অধিক খেলাধূলার মাঠ সর্বতোভাবে খেলার উপযোগী করে রাখে। এ সব নানা সুযোগ-সুবিধার জন্যে মাত্র ৯০ লক্ষ লোকের দেশ সুইডেন খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশ্বের সেরা খেলোয়ারদের সমপর্যায়ে পৌছতে সক্ষম হয়েছে। তা ছাড়া গ্রীষ্মকালে শহরের বিভিন্ন স্থানে শিল্প-সাহিত্য ও কৃষ্টির বিকাশ সাধনের জন্যে ৩০ টিরও অধিক খোলা অঙ্গনে ব্যালে নাচ, গান, নাটক ও বাদ্য বাজনার আসর বসে প্রতিদিন। এগুলো উপভোগ করতে কোন পয়সা লাগে না। তারই জন্যে এখানকার সাংস্কৃতিক জীবনও সমৃদ্ধ। এখানেই অবস্থিত ২০০ বছরের পুরানো রয়েল অপেরা হাউস এবং রয়েল ড্রামাটিক থিয়েটার। ৫০ টিরও অধিক বিভিন্ন ধরনের মিউজিয়াম স্টকহল্‌মকে করে তুলেছে এক অনন্য শহর। স্টকহল্‌মের টুনেলবানান যে পৃথিবীর দীর্ঘতম চিত্রশালা তার বিস্তারিত বিবরণ এর আগের পর্বেই দিয়েছি।

একটা দেশ কি এমনিতেই বড় হয়ে যায়? মোটেই না। সমগ্র জাতির শত শত বছরের একান্ত পরিশ্রম দিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয় একটি দেশ। এভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে সুইডেন ও স্টকহল্‌মকে। এখানে স্মৃতির বোঝা মাথা থেকে কিছুটা নামিয়ে রাখার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তাই পাঠক সমীপে তুলে ধরছি।

১৯৭৫ সন। আমি বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ জলপরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান। সংস্থার 'গাজী' নামক জাহাজে করে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের শ্রদ্ধেয়া আম্মার শেষকৃত্য সমাপ্ত করে রাষ্ট্রপতিকে নিয়েই তাঁর দেশের বাড়ী টুঙ্গিপাড়া থেকে ঢাকা ফিরছিলাম। জাহাজ মেঘনায় তখনও পড়েনি কিন্তু মেঘনার সুদূর বিস্তারিত জলরাশি দেখা যাচ্ছে। বেলা ১১টা। আলো ঝলমলে আকাশ। জাহাজের প্রথম শ্রেণীর ডেকে ইজি চেয়ারে বসে জনাব কোরবান আলি ও আমি নানা বিষয়ে আলাপ করছি। একসময় বললাম যে, সোনার বাংলা গড়া আমাদের দ্বারা সম্ভব হল না। কোরবান আলি সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমার এই উক্তি করার হেতু কি? আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কোন কার্যকরী

www.pathagar.com

পদক্ষেপ না নিতে পারার জন্যেই সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হলো না। তিনি আমাকে আরও খোলাসা করে বলতে বললেন। আমি তখন আমার চিন্তাধারা যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলাম তা আমার মনে গ্রথিত আছে। আমি বলেছিলাম চোখ বুজলেই সোনার বাংলার চিত্র যিনি পরিষ্কারভাবে দেখতে পান তাঁর পক্ষেই কেবল সোনার বাংলা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। সৃষ্টির পূর্বশর্ত হচ্ছে একটা বাস্তবমুখী স্বপ্ন মনে গেঁথে নেয়া এবং পরিকল্পিত উপায়ে সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেয়া। উদাহরণস্বরূপ বললাম যে, মাইকেল এঞ্জেলো যখন একখণ্ড বিরাট পাথর তাঁর ছেনি ও হাতুড়ি দিয়ে ঠুক ঠুক করে কাটতে থাকলেন তখন কি হঠাৎ করেই একদিন এক মূর্তি বেরিয়ে এলো না, তাঁর মাথায় মূর্তিটির বাস্তব চিত্র ছিল যা তিনি তাঁর দক্ষতা ও অধ্যবসায় দিয়ে দিনের পর দিন কাজ করে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

এই মুহূর্তে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি 'ডেকে' এসেছেন। আমরা দাঁড়ালাম তিনি আমাদের বসতে বলে স্বয়ং আমার বাঁ পাশের ইজি চেয়ারটিতে বসলেন। ডান হাতে তাঁর ধূমপানের পাইপটি ছিল। তিনি ইজি চেয়ারে ডান দিকে ঝুঁকে আমার কথা শুরু করতে আদেশ করলেন। আমি যখন বললাম, 'না স্যার এমন কিছু না'। তখন তিনি দৃঢ়তার সাথেই বললেন 'যা বলছিলা তাই বল'।

আদিষ্ট হয়ে আমি আবার শুরু করলাম। তিনি গভীর মনোযোগের সাথে শুনতে থাকলেন। পাইপ টানতেও যেন ভুলে গেলেন। আমি শুরু করলাম এই বলে যে, সৃষ্টির প্রথম শর্ত হচ্ছে 'Vision' অর্থাৎ স্বপ্ন। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে চাই ঐকান্তিক ইচ্ছে ও দৃঢ়সঙ্কল্প, শিল্পীর দক্ষতা ; কঠোর ও একনিষ্ঠ পরিশ্রম দেয়ার মত ক্ষমতা এবং সর্বোপরি ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণ করে এগিয়ে চলা। কোরবান আলি এই মুহূর্তে একটু বাঁধা দিয়ে বললেন যে, সবই বুঝলাম কিন্তু ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণের কথাটা ঠিক বোধগম্য হল না। আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝালাম যে, ইটালির বিখ্যাত শিল্পী 'লিউনার্দ দাঁ ভিন্সি' যখন তাঁর বিখ্যাত বিশ্বখ্যাত মোনালিসার সূক্ষ্ম হাসিটি ঠোঁটের কোণে একটি তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তখন যদি গভীর একাগ্রতার সাথে তার অন্তর্নিহিত ভাবের বহিঃপ্রকাশ না ঘটাতে পারতেন তাহলে সেই হাসিটি বিশ্ববিখ্যাত মাধুরী মিশ্রিত মোহময় হাসি না হয়ে একটা ক্রুর হাসিও হয়ে যেতে পারত। আমি তারপর বললাম যে, সোনার বাংলা গড়তে গেলেও সৃষ্টির এই ধারাকেই অনুসরণ করতে হবে। শিল্পীকে অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে দেশের নেতাকে ২৫ বছর পরের বাংলাদেশের চিত্রকে মনে গেঁথে নিতে হবে এবং তারপর সেই রূপ বাস্তবায়নের জন্যে সমগ্র দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তারাও একনিষ্ঠভাবে নিজেদের ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রণে রেখে কঠোর শ্রম দেয় এবং নেতার সার্বিক পরিকল্পনাকে প্রস্ফুটিত করে তোলে।

www.pathagar.com

এই মুহূর্তে শেখ সাহেব উঠলেন এবং কোন প্রকার ভূমিকা না রেখেই বললেন 'রহমান ..... হয় না..... হয় না' এই বলে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। সেই মুহূর্তে তার মুখমণ্ডলে সোনার বাংলা গড়তে না পারার দুঃখ এবং ব্যর্থতার বেদনা ও গ্লানি আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর সেই করুণ চেহারাটি এখনও আমার মনে ভাসে। তিনি বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে ভালবাসতেন বলেই অকৃতকার্যতার বেদনা ছিল তাঁর গভীর।

'রহমান.... হয় না.... হয় না' কিন্তু কেন হয় না এর ব্যাখ্যা বঙ্গবন্ধুর নিকট থেকে পাবার সুযোগ আর হয়নি। এর মাত্র কিছুদিন পরই দুবৃর্ত্তের নিষ্ঠুর আঘাতে তিনি চিরতরে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

অতীত থেকে বর্তমানে স্টকহল্‌মেই ফিরে যাই। সুইডিশ জাতি নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হয়েছে। কঠোর শ্রমের মাধ্যমে তারা গড়ে তুলেছে নিজেদের জন্যে শান্তি ও সমৃদ্ধির এক দেশ। আমাদের দেশের মত ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত না হয়ে, নিজেদের খেয়ালখুশিমত ঘটনা বিকৃত করে ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা না করে, পুরানো যা কিছুই আছে তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে না ফেলে এবং নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হয়ে, গত হাজার বছরের ইতিহাসকে থরে থরে সুন্দরভাবে সাঁজিয়ে রেখেছে বলেই আজ সুইডেন সভ্য দেশ বলেই বিশ্ব সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে।

।।৫।।

প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের সুইডেন

প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে, ১২০০০ বছর পূর্বে সুইডেন ছিল কয়েক মাইল পুরু বরফের স্তরে আচ্ছাদিত। তারপর কয়েক হাজার বছরের বিবর্তন পৃথিবীর বরফের চাদর গলিয়ে ফেলল এবং ভূপৃষ্ঠকে করল অনাবৃত। সুইডেনের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় যে, খৃস্টপূর্ব প্রায় ৩০০০ বছর পূর্বে সুইডেনের আদিম অধিবাসীরা প্রথম কৃষিকার্য ও পশু পালন শুরু করে।

রোমান ঐতিহাসিক টেসিটাসের বর্ণনা অনুযায়ী স্‌ভিয়ার নামক একটি অত্যন্ত সাহসী, পরাক্রমশালী ও দুর্ধর্ষ উপজাতি মেলারেন হ্রদের আশে পাশে বসবাস শুরু করে। এরাই পরবর্তী কালে ৮০০-১০৫০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৫০ বছর মহাসমুদ্রে ভাইকিং দস্যু হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল এবং সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজ সমূহের ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে বেড়াত। ভয়ভীতিহীন সমুদ্রচারী এই ভাইকিং দল দুর্দমনীয় হিংস্রতা নিয়ে অন্য দেশের বাণিজ্য যান ও পোতের উপর চড়াও হয়ে

www.pathagar.com

অবাধে লুটপাট করত এবং আহরিত সম্পদ এনে নিজেদের দেশ সুইডেনকে করে তুলত সমৃদ্ধ। একদিকে যেমন এই ভাইকিং জলদস্যুরা হিংস্র ও অত্যাচারী ছিল অন্যদিকে এরাই জন্ম দিয়েছে অনেক সাগর সংক্রান্ত কবিতা ও লোকগাঁথা এবং নানা দেশের কৃষ্টির সংমিশ্রণে সৃষ্ট নূতন সংস্কৃতি।

ভাইকিং দস্যুদের আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার ছিল তাদের উঁচুমানের জলযান। তারা জলপথে যেয়ে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের উপকূলে আঘাত হানত ও লুটতরাজ করত। শেষ পর্যন্ত তারা একদিকে উত্তর আমেরিকার উপকূল এবং অন্যদিকে নদীপথে রাশিয়ার অভ্যন্তরে নভোগ্রাড, কিয়েভ ও কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌছে যায়। লুটতরাজের সাথে সাথে বাণিজ্যের দিকেও এরা ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ে এবং দেশ বিদেশ ভ্রমণ করার ফলে এদের ব্যবহারেও অনেক পরিবর্তন আসে। এই পন্থায় এরা খৃস্টধর্মকে নিয়ে আসে সুইডেনের ভূমিতে এবং ৮৩০ খৃস্টাব্দে সুইডেনের বিরকা নামক স্থানে প্রথম গীর্জা স্থাপন করে। সভ্যতা বিস্তার লাভের সাথে সাথে খৃস্ট ধর্ম প্রাধান্য পেতে থাকে এবং কালক্রমে সুইডেনের অন্যতম ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১১৬৪ খৃস্টাব্দে 'উপসালা' নামক স্থানে রোম কর্তৃক প্রথম আর্চবিশপ মানে খৃস্টান ধর্মীয় মহাযাজক নিয়োগ করা হয়। সুইডেনের প্রথম বিদ্যাপীঠও ছিল উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪ র্থ পর্বে লিখেছি যে সুইডেনের অধিবাসীরা তাদের দেশ গড়ে তুলেছে তাদের কঠোর পরিশ্রম দিয়ে। স্বাধীন সত্তার জাতি হিসেবে বিশ্ব সমাজে সুইডেনের বিশেষ খ্যাতি আছে। সে ইতিবৃত্তে পরে লেখা যাবে। বর্তমানে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ১৩৯৭ খৃস্টাব্দ থেকেই ডেনমার্কের সুদক্ষ ও বিচক্ষণ রাণী মারগারেটা সুইডেন, নরওয়ে এবং ডেনমার্ক একত্রিত করে ইউরোপের সর্ববৃহৎ ও সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। সে থেকেই শুরু তাদের অগ্রযাত্রা। বর্তমানে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটিয়ে সুইডেনের ভ্রমণ বৃত্তান্তেই ফিরে আসা যাক।

৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বাসে কিংবা পায়ে হেঁটে শহর দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়েছি। দিনটাও আজ মোটামুটি উজ্জ্বল। আমরা টি-সেন্ট্রালেন স্টেশন পর্যন্ত ভূনিম্ন গামী ট্রেনে করেই এলাম। গাড়ী থেকে নেমে প্রায় ৭০/৮০ ফিট উপরে উঠলে ভূপৃষ্ঠে পৌছানো যাবে। এ সব ক্ষেত্রে 'এসকেলেটর' অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ কিংবা চলন্ত সিঁড়ি করেই উপরে উঠতে হয়। কিন্তু আমাদের সামনে যে সিঁড়িটি আছে তাতে কেউ নেই এবং সিঁড়িটিও বন্ধ। আমি একটু হতাশ হলাম এই ভেবে যে, এতটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হবে। আমাদের সাথী হাসেম সাহেবকে দেখলাম নির্বিকার এবং সেই থেমে থাকা সিঁড়ির দিকেই তার দৃষ্টি। হাসেম সাহেবই যখন পথ প্রদর্শক তাই তাঁকেই অনুসরণ করলাম। কি আর্শ্চয সিঁড়ির কাছাকাছি যেতেই ভ্রাম্যমাণ সিঁড়ি

www.pathagar.com

সচল হয়ে উঠল। আমরা সিঁড়িতে দাঁড়ালাম এবং সিঁড়ি আমাদের নিয়ে মন্থর গতিতে উপরে উঠতে থাকলো।

উপরে এসে আমরা সিঁড়ি থেকে নেমে যেতেই দেখলাম সিঁড়ি আবার বন্ধ হয়ে গেল। হাসেম সাহেব বললেন যে এখানকার ভ্রাম্যমাণ সিঁড়িসমূহে 'ইলেকট্রনিক সেন্সর ডিভাইস' বসানো থাকে। এই সেন্সর ডিভাইস হচ্ছে এক প্রকার যন্ত্র যা আঁচ করতে পারে যে, সিঁড়ি ব্যবহার করার জন্যে কেউ আসছে কিনা এবং যদি একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে ব্যবহারকারী চলে আসে তখনই ইলেকট্রিক সুইচ মেশিন চালু করে দেয় এবং তখনই সিঁড়ি চলা শুরু করে। অনুরূপভাবে ভ্রাম্যমাণ সিঁড়িটি যদি অব্যবহৃত থাকে তাহলেও তা আঁচ করে যন্ত্রটি সুইচ বন্ধ করে দেয় এবং সিঁড়ির চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়।

আপনারা হয়ত অনেকেই অটোমেটিক দরজা বন্ধ হওয়া দেখেছেন। স্বাভাবিক গতিতে দরজার দিকে এগুলেই দরজা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে নিজেই আঁচ করে খুলে যায় এবং কেউ না এলে দরজা বন্ধ অবস্থায় থাকে। ভ্রাম্যমাণ সিঁড়িও একই পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

ভ্রাম্যমাণ সিঁড়িতে নিশ্চয়ই অনেক বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যয় হয়। যদি নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের ব্যবস্থার মাধ্যমে দিন-রাতের বিভিন্ন সময়ে ১০০ মাইলব্যাপী ১০০০ স্টেশনে যদি অপ্রয়োজনীয় বিদ্যুত ব্যবহার রোধ করা যায় তাহলে বিপুল পরিমাণে বিদ্যুত শক্তির সাশ্রয় হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। ইংরেজীতে একটা কথা আছে যে, 'Waste not-want not' অপব্যয় করো না অভাবগ্রস্ত হয়ো না। পাশ্চাত্য দেশসমূহ যেখানে যতটুকু সম্ভব বাঁচাতে চেষ্টা করে বলেই তাদের এ জাতীয় ধরনের চাহিদা বার বার উত্থাপিত হয় না। আমাদের দেশে রাস্তায় রাস্তায় লেখা থাকে যে 'অপচয়কারীরা শয়তানের বন্ধু'। এটা হচ্ছে পবিত্র আল-কোরআনের আয়াত। অথচ সবচেয়ে অপচয়কারী হচ্ছি আমরা মুসলিম দেশের অধিবাসীগণ। আমরা মনে করি ধর্মঘট, হিংসাত্মক কার্যক্রম, জ্বালাও, ঘেরাও কর্মসূচী আমাদের রাজনৈতিক অধিকার এবং আমাদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আমাদের সমাজপতিগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিনা দ্বিধায় এ সব ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের উস্কানি যুগিয়ে যাচ্ছেন। তারা একবারও ভাবছেন না যে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি আমাদের সম্পদ ধ্বংস না করতাম তাহলে আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে একই জিনিষের চাহিদার পুনরাবৃত্তি করতে হত না। এতে আমাদের স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হত। প্রতিনিয়ত ভিক্ষার হাত বাড়ানোর প্রয়োজন আমাদের হত না। এমনও হতে পারত যে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরাও দাতা হিসেবে নাম লেখাতে পারতাম।

www.pathagar.com

ইলেকট্রনিক যন্ত্রের কথাই যখন হচ্ছে তখন সুইডেনের আরও একটা সুন্দর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উল্লেখ করছি। একদিন হাসেম সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা রীতাকে নিয়ে এক দোকানে গেলাম এবং যেহেতু রীতা সুইডিশ ভাষা মোটামুটি ভালই জানে তাই একটা ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার জন্যে রীতাকে এগিয়ে দিলাম। কিন্তু সে কোন দোকান পরিচারিকার নিকট না যেয়ে একটা ছোট মেশিনের নিকট গেল ও বোতাম টিপল। একটা টিকেট বেরিয়ে এল এবং তাতে ছিল শুধু একটা ছাপানো নম্বর। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, কোন একজন পরিচারক কিংবা পরিচারিকার সাহায্য নিয়ে দু'একটা তথ্য সংগ্রহ করা। রীতা টিকেটটি নিয়ে নম্বরটি দেখে বলল, আমাদের কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। আমি উপলব্ধি করলাম যে, আমাদের দেশীয় প্রথায় গায়ে পড়ে যে কোন দোকান কর্মচারীর নিকট তথ্য চাইতে গেলে তারা তা মোটেই পছন্দ করে না। সাধারণত বলে থাকে যে, দয়া করে আপনার পালা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারা যে গ্রাহককে যখন সেবা দিচ্ছে তখন অতি নিষ্ঠার সাথে শুধু তাকেই সেবা দিয়ে থাকে। তাকে ছেড়ে অন্যকে সে মুহূর্তে দেখাশোনা করাটা তারা প্রথম গ্রাহকের প্রতি অভদ্রতামূলক আচরণ বলে মনে করে। তাই গায়ে পরা গ্রাহককে তারা একটু উপেক্ষাই করে থাকে। ইংল্যান্ডেও এই প্রথাই প্রচলিত আছে।

সুইডেনের টিকেট নেয়ার রীতিটা মনে হল ইংল্যান্ডের লাইনে দাঁড়িয়ে পালা করে এগিয়ে যাবার চেয়ে অনেকটা উন্নত ও আধুনিক। একবার লাইনবন্দী হলে লাইন ছেড়ে সরে গেলে তার অধিকার নষ্ট হয়ে যায়। লম্বা লাইন হলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় এবং লাইনে দাঁড়িয়ে হয় সময় গুনতে হয় নয়ত বা পত্রিকা কিংবা সাময়িকী পড়তে হয়। পা ধরে আসে তবু লাইন ছাড়া যায় না। সুইডেন এই অসুবিধার একটা বিহিত করেছে। টিকেট কেটে যদি মনে করেন যে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তা হলে আপনি 'Window Shopping' যাকে বলে একা একা কাঁচের আলমারির ভেতরের দ্রব্যাদি পছন্দ করতে পারেন কিংবা মূল্য যাচাই করতে পারেন কিংবা কোথাও বসে একটু বিশ্রাম নিতে পারেন। লাইনে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই, তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, আপনার পালাটি যেন আপনি না খুইয়ে বসেন। কাউন্টারের (যেখানে সেবক কি সেবিকা সেবা দিয়ে থাকে) ঠিক উপরেই বেশ বড় করে নম্বর লেখা থাকে। যখনই একজন গ্রাহক বিদায় নিল তখনই সেবক কিংবা সেবিকা একটা সুইচে টিপ দেবে এবং তার ঠিক উপরের নম্বর প্লেটের নম্বরে পরিবর্তন ঘটবে। এটা যদি আপনার নম্বর হয় তাহলে আপনি এগিয়ে যাবেন এবং নিশ্চিত সেবা পাবেন। কাউন্টার যদি দু'তিনটা হয় তাহলে নম্বর প্লেটও দু'তিনটেই হবে। সুইডেনের এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইংল্যান্ড থেকে নিঃসন্দেহে এক ধাপ উপরে।

সুইডেনে প্রধানত ৪ টা ঋতু। তবে শীতকাল যে একটা প্রধান শক্তিশালী ঋতু এবং মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের বসন্ত কালের অনেকখানি কব্জা করে রাখে তাতে

www.pathagar.com

কোন সন্দেহ নেই। কড়া শীতের পর মার্চ মাস হাত-পা সোজা করে দাঁড়িয়ে বসন্তের প্রথম গীত গাওয়ার আগেই এপ্রিল এসে যায়। অনুরূপভাবে শরত কাল শীতের ভয়েই অক্টোবর মাসের অধিকাংশ সময় যৌতুক হিসেবে শীতকালকে দিয়ে দেয়। তাই বছরের প্রায় ৫ মাসই শীতকাল। শুনেছি যে গ্রীষ্মকাল ফুল, ফল ও পল্লবীতে এমনভাবে চারদিক সাজিয়ে তোলে যে মনে হয় সারা দেশে মেলা বসেছে। তুষারশুভ্র পরিবেশ যেন যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় ঘন সবুজে রূপান্তরিত হয়ে যায়। হাসেম সাহেবরা বলেন, আমরা শীতকালের কষ্টটাই সহ্য করে গেলাম। আর আমরা মনে করি যে, চারদিকের শান্ত পরিবেশ প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারলাম শুধু শীতকাল বলেই এটা সম্ভব হলো।

বর্তমানে বাসে-ট্রেনে ভীড় নেই। মেলারেন হ্রদের তীর ধরে যে বাস ঝুরগার্ডেনে যায় কিংবা ছোট ট্রেন এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বাড়ীর পাশ দিয়ে আঙ্গিনা বিভক্ত করে বনে লুকোচুরি খেলতে খেলতে হঠাৎ করে ঘন নীল হ্রদের ধারে গিয়ে ধরা দেয় সে আবেগময় পরিবেশ কি গ্রীষ্মের ভীড়ে হারিয়ে যাবে না? লাস্যময়ী স্টকহল্‌ম সব ঋতুতেই সোহাগ ভরে পর্যটককে বুকে টেনে নিতে জানে। সেই তৃপ্তি আমরা জানুয়ারী মাসে (-) ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসেও পেয়েছি।

।।৬।।

মধ্য যুগের সুইডেনের ইতিহাস ও বর্তমানের সুইডেন

সুইডেন হল কঠিন শিলার পাহাড়ী দেশ। ভূমির প্রায় সবটাই পাহাড়ী অঞ্চল এবং ঘন জঙ্গলে আবৃত বনভূমি। সাধারণ হিসেবে উত্তরাঞ্চলের প্রায় ৬০ শতাংশ বনভূমি। দেশের মাত্র এক দশমাংশ কৃষি উপযোগী জমি।

স্টকহল্‌মের রাস্তার ধারে দেখা যাবে অত্যন্ত কঠিন শিলার ছোট ছোট ঢিবি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। নানা বর্ণের শিলা দেখে মনে হয় যেন প্রকৃতি পর্যটকের মনোরঞ্জনের জন্যে এগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে। কঠিন শিলার ঢিবির উপর এ দেশীয় বড় বড় গাছ বেশ স্বচ্ছন্দে বেড়ে উঠেছে। শিলা ভেদ করে এসব গাছের শিকড় অবলীলাক্রমে রস টেনে এনে জীবন ধারণ করতে পারছে। প্রকৃতির সাথে অবস্থান করে বেঁচে থাকার তাগিদে গাছকেও শক্তসামর্থ্য হতে হয়। অনুরূপভাবে এখানকার মানুষগুলোকেও বেশ জোয়ান হতে হয়। পুরুষের সাধারণ উচ্চতা ৫ ফিট ৮/৯ ইঞ্চি হবে। সাড়ে ৬ ফিট ৭ ফিট উঁচু লোক প্রায়ই রাস্তাঘাটে দেখা যায়। মেয়েরাও উচ্চতায় গড়ে সাড়ে ৫ ফিটের মত হবে এবং তাদের মধ্যেও ৬ ফিট উঁচু মেয়ে প্রচুর দেখা যায়।

www.pathagar.com

আমরা শীতকালে সুইডেন ভ্রমণে গিয়েছি। তাই দেখতে পাচ্ছি নানা জায়গায় জমা বরফ। ছোট ছোট অগভীর ঝিলগুলোর উপর পানি স্বচ্ছভাবে জমে আছে। মনে হয় যেন এক খণ্ড কাঁচ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। এর উপর পাখীরা হেঁটে বেড়ায়। নৌকাগুলো জমাট বাঁধা বরফের উপর ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকেই শুভ্র বরফের চাদরের আবরণে ধরণী অপেক্ষমান থাকে কখন আবার আসবে প্রাণের সঞ্চার। যাদুর স্পর্শেই একদিন হঠাৎ এসে যায় বসন্ত। ঝরা পাতাওয়ালা গাছসমূহ আবারও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। পল্লবহীন বৃক্ষ শাখা হতে ফুঁড়ে বেরুতে থাকে সবুজের জোয়ার। নানা বর্ণের ও নানা ধরনের ফুলের অঙ্কুর প্রকৃতির কপালে পরিয়ে দেয় টিপ, এঁকে দেয় কুমকুম ও চন্দনের প্রলেপ, চারদিকে ছড়িয়ে দেয় ফাগ। নব জীবনের আবেশময় মাধুর্যে রাঙিয়ে তোলে চারদিক। বনানী তখন নূতন উৎসবে মেতে ওঠে। বসন্তের আবির্ভাবে গাছে গাছে, ডালে ডালে ফুলের সমারোহ বনভূমিকে নববধূর সাজে সাজিয়ে তোলে। সেই সাথে সুর মিলিয়ে রাস্তায় রাস্তায় বাদ্য, নাচ, গান সারা দেশকে উৎসব মুখর করে তোলে।

তখন লেকের পানি বরফের আবরণ ফেলে দিয়ে তরল উচ্ছল হয়ে ওঠে। বন্য হাঁস ও পাখীদের তখন আর বরফের উপর হাঁটতে হয় না এবং স্কেটিংরত বাড়ন্ত প্রাণবন্ত ছেলেমেয়েদের লেকের বরফের উপর আর দেখা যায় না। নতুন মওসুমের সাথে নতুন মেলা বসে। লেক হয়ে ওঠে স্বচ্ছ পানিতে ভরপুর। পাখীরা উড়ে বেড়ায়, পানিতে সাঁতার কাটে, নৌকা ও ডিঙ্গি লেকে ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই জলকেলিতে মগ্ন হয়ে পড়ে। আর একটু দূরে সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের ভীড় জমে বেলাভূমিতে সূর্যস্নান, তরঙ্গায়িত হিল্লোলে জলকেলি ও ঊর্মিতে অবগাহন করার উদ্দেশ্যে এরা দূর দূরান্ত থেকে আসে। উপকূলীয় এলাকার স্বল্প পানিতে শুরু হয় Scuba diving অর্থাৎ ডুবুরিদের লীলাখেলা। শুধু সমুদ্র সৈকত কেন পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে শুরু হয় Guided tour অর্থাৎ পরিচালিত সফর, পর্বত পথে পদভ্রমণ। চারদিকে বসে যায় বসন্ত ও গ্রীষ্মের আনন্দমেলা। তীরে শিশুদের জন্যে চলে আসে উপভোগ করার নানা সামগ্রী। চারদিকে কেবলই শুধু উল্লাস আর উল্লাস। জীবনটা এরা যেমন গড়তে জানে তেমনি দু'হাতে খরচ করে ভোগ করতেও জানে। এ জাতির ইতিহাস রয়েছে। ৫ম পর্বে আমি আদিকাল থেকে শুরু করে ভাইকিংদের রাজত্বকাল পর্যন্ত সুইডেনের ইতিহাসের আভাস দিয়েছি। এবারে তারপর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত রাজা-রাণীদের কিচ্ছা-কাহিনী একটু বলে নেই। দেশটাকে চিনতে হলে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথেও পরিচিত হতে হয়।

রাণী মারগারেটার শাসনামলে ১৩৯৭ খৃস্টাব্দে গঠিত ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইডেনের বৃহৎ সাম্রাজ্যের ভিতে আঘাত হানল ১৪৩০ খৃস্টাব্দে সুইডেনের নেতা এনগেলব্রেক্ট। তিনি ১৪৩৫ খৃস্টাব্দে সুইডেনের প্রথম পার্লামেন্টের মাধ্যমে নূতন

www.pathagar.com

শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। কিন্তু এই জনপ্রিয় নেতা তাঁর অনুচরদের হাতেই নিহত হলেন। কিন্তু রিক্‌স্‌ডাগ অর্থাৎ পার্লামেন্ট খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ১৫২০ খৃস্টাব্দ অবধি চলল। তারপর রাজা ক্রিস্টিয়ান II সুইডেনবাসীর হাতে নির্বাচিত হলেন। তিনি ছিলেন অত্যাচারী। তিন বছরেরও অধিক কাল ধরে অকথ্য অত্যাচার চালান এবং সুইডেনের সম্ভ্রান্ত পরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে থাকেন। এই অত্যাচার রোধ করার জন্যে গুষ্টভ ভাসা নামক একজন 'নব্‌ল্‌ ম্যান' (অভিজন) সুইডেনের ডারলানা নামক প্রদেশের সাধারণ কৃষকদের সাহায্যে নিষ্ঠুরতার অবসান ঘটান এবং ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৭ বছর বয়েসে রাজা সেজে বসেন।

গুষ্টভ ভাসা অত্যন্ত সাহসী, সৎ ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় পরিচালন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, চার্চের ক্ষমতা সীমিতকরণ এবং চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের মত অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূর প্রসারী সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে তৎকালীন ইউরোপে এক উঁচুমানের শাসকের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'ভাসার' শাসন আমলের পর তাঁর বংশধরগণ পরবর্তী ১৫০ বছর সুইডেন শাসন করে।

ভাসা রাজাদের মধ্যে গুস্টাভাস অ্যাডলফাস ১৬১১ খৃস্টাব্দে মাত্র ১৭ বছর বয়েসে রাজা হন এবং তাঁকেই ভাসা রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ রাজা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি রাশিয়া ও পোল্যান্ড জয় করেন এবং সপ্তদশ শতকে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁকেই সুইডেনের গর্ব বলে বিবেচনা করা হয়। ১৬২৮ খৃস্টাব্দে, সেই যুগে পৃথিবীর বিখ্যাত সমুদ্রগামী জাহাজ 'ভাসা' তিনিই তৈরী করান। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, সে জাহাজ সমুদ্রের মুখও দেখতে পেল না। প্রথম সমুদ্র যাত্রার উদ্দেশ্যে নির্গত হয়ে জাহাজটি বন্দরেই নিমজ্জিত হয়। বৃটিশদের দ্বারা নির্মিত ৪৬০০০ গ্রস টনের বিশাল প্রমোদতরী টাইটানিক যাকে নির্মাতারা বলেছিল যে, ওটা ডুবতে পারে না সেটা যেমন ১৯১২ সনের ১৪ এপ্রিল তারিখে প্রথম যাত্রাতেই সমুদ্রের অতল গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবেই ভাসাও হারিয়ে যায়।

ভাসা নিমজ্জিত হবার কয়েক বছর পর গুস্টাভাস অ্যাডলফাস জার্মানিতে প্রোটেস্টান্ট ধর্মাবলম্বীদের রক্ষার্থে ধর্মযুদ্ধে যোগ দেন এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।

গুস্টাভাস অ্যাডলফাসের মৃত্যুর সময় তার কন্যা 'কৃষ্টিনা' মাত্র ৬ বছর বয়েসের ছিল। পরে তিনি রাণী হন এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন এবং রোমে যেয়ে বসবাস শুরু করেন। তার পিতা যা চেয়েছিলেন তিনি ঠিক তার উল্টোটাই করেন।

www.pathagar.com

সপ্তদশ শতাব্দীতে সুইডেন এস্টোনিয়া ও বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী জার্মানীর কিছু অঞ্চল এবং ডেনমার্ক ও নরওয়ে জয় করে আবার এক বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করে। এমন কি আমেরিকার ডেলাওয়ারকেও সুইডেনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ডেলাওয়ার রাজ্য পরে বৃটিশরা দখল করে নেয়। প্রদীপ নিভে যাবার পূর্বে যেমন জ্বলে উঠে সুইডেনও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তেমনি জ্বলে উঠেছিল। ১৭১৮ খৃস্টাব্দে তাদের সম্রাট চার্লস XII নিহত হবার পর সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়।

সুইডেন ভ্রমণে এসেছি তাই রাস্তা ধরেই চলি। ৪৭ নম্বর বাস ধরে স্কানসেন-এর দিকে রওয়ানা হলাম। যাবার পথটার ডান দিকে রাস্তা ছোঁয় ছোঁয় অবস্থায় ছিল সমুদ্র খাঁড়ির নীল পানি, আর বাম দিকে অত্যন্ত সুসজ্জিত অভিজাত আবাসিক এলাকা অস্টারমালম্। আর একটু সামনে যেতেই আমাদের বাঁ পার্শ্বে রইল হিসটোরিকা মিউসেট অর্থাৎ হিসটরি মিউজিয়াম (জাতীয় ইতিহাসের যাদুঘর)। একটু পরই বাস ডান দিকে মোড় নিয়ে একটি সেতু পেরিয়ে ঝুরগার্ডেন দ্বীপে পৌঁছলো। এই দ্বীপেই আছে স্কানসেন টাওয়ার, নরডিস্কা মিউজিয়াম, ভাসা মিউজিয়াম এবং বায়োলজিক্যাল মিউজিয়াম। স্কানসেন মিউজিয়াম খোলা আকাশের নিচে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থিত। বিভিন্ন প্যাভেলিয়নে (সুসজ্জিত ভবনে) চিত্র ও মূর্তি দ্বারা সাজিয়ে, প্রাচীনকালে সুইডেনের জীবনধারা কেমন ছিল তাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অতি সুন্দরভাবে। সুন্দর মিনি ইন্দোনেশিয়া পার্কে ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস যে ভাবে দেখানো হয়েছে অনেকটা সে ভাবেই। আমার লেখা 'জীবন তরঙ্গ বই-এর অর্কিডের দেশের ষষ্ঠ অধ্যায়ে' সুন্দর মিনি ইন্দোনেশিয়া পার্কের কিছুটা ধারণা দেয়া হয়েছিল। স্কানসেনে তার দিয়ে ঘেরা স্থানে একটা উন্মুক্ত চিড়িয়াখানাও আছে এবং সেখানে রয়েছে অনেক প্রাণী। দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করে শ্বেত ভল্লুক, বাইসন এবং অন্যান্য শীতপ্রধান দেশীয় জন্তু-জানোয়ার। এবারে শুধু চিড়িয়াখানার পাশ দিয়েই বাসে করে গেলাম। ১৯৯২ সনে (-) ১০ ডিগ্রী সেলসিয়াসে জমা বরফের ক্রিস্টালের উপর দিয়ে হেঁটে এই চিড়িয়াখানাটির আদ্যোপান্ত দেখেছিলাম মার্চ মাসে ত্রিপলিতে আইডিবি মিটিং-এর শেষে। যদিও বর্তমানে শীত অতটা প্রখর নয় তবু শীতকালের ভ্রুকুটি সহ্য করেই আমাদের চলতে হচ্ছে। আমরা এখানে ওখানে দেখতে পাচ্ছি জীবনের উচ্ছলতা ও চঞ্চলতা। তরুণ-তরুণীরা আধো পানি ও তীরসংলগ্ন আধো বরফের চাদরের উপর দিয়ে মচ মচ করে হাঁটা উপভোগ করছে। তাদের পায়ের কাছে পাতি হাঁস, বালি হাঁস এবং নানা ধরনের, নানা বর্ণের ও গোত্রের ছোটবড় হাঁসগুলো ঘোরাফেরা করছে। যুবক-যুবতীদের সাথে হাঁস ও পাখীদের সখ্যতা আছে। হাঁস তাদের ভয় পায় না এবং যুবক-যুবতীরাও পাখীদের উপদ্রব করে না বরং দেখতে পাচ্ছি যে, তারা কিছু খাদ্য ছিটিয়ে চলেছে এবং হাঁসেরা ঠেলাঠেলি করে কুঁড়িয়ে খাচ্ছে। দু'চারজন উৎসাহী

www.pathagar.com

তরুণ-তরুণী জমাট বরফের উপর বসে হাঁসদের সোহাগ ভরে কাছে টেনে আনছে। দেখতে বেশ ভাল লাগে।

লেকের টল টলে পানি দেখলেই প্রাণ চায় স্পর্শ করে দেখি কিন্তু তরুণ-তরুণীদের পক্ষে যা সম্ভব এই শীতে আমাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই অদম্য উৎসাহ নিবৃত্ত করি। ঢাকাতে ধানমণ্ডি, গুলশান এবং রমনা গ্রীনের লেকের পানি দেখলে বিতৃষ্ণায় মন ভরে ওঠে। রঙ দেখলে পানি বলে মনে হয় না এবং তার উপর জঞ্জালের স্তূপ পচে-গলে বিশ্রী দুর্গন্ধময় কালো পদার্থের সর পড়ে আছে। পানি স্পর্শ করা তো দূরের কথা, পানির কাছাকাছি ঘেঁষতে ইচ্ছে হয় না। আবাসিক এলাকার পয়ঃপ্রণালীর উচ্ছিষ্ট এমন কি মলমূত্রের প্রবাহনালী নির্ভাবনায় লেকে ফেলা হচ্ছে। লেকসমূহ যেন আমাদের জাতীয় ডাস্টবিন ও ল্যাট্রিন। লেকের পার ধরে গরু-মোষ রাখা হয়। এদের মলমূত্র হরদম লেকের পানিতে পড়ছে। তা ছাড়া লেকের ধার ধরে গড়ে ওঠে বস্তি এলাকা এবং আমাদের কৃষ্টিগত ল্যাট্রিন সমূহ লেকের পানিতে সরাসরি নিষ্কাষিত হয়।

প্রশ্ন জাগে মনে যে, লেকের পানিটাও কি রক্ষা করার দায়িত্ব কেউ অনুভব করে না? ময়লা না করার সামাজিক দায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা যদি অবহিত থাকতাম কিংবা আমাদের সমাজপতিরা সমাজকে সচেতন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন এবং সাথে সাথে পরিবেশ দূষিত করার জন্যে শাস্তিমূলক আইনের বিধান থাকতো এবং তা প্রয়োগ করা হতো তাহলে এই দুরবস্থা আমাদের হতো না। তখন আমরাও লেক ও লেকের চারধার প্রমোদ উদ্যান হিসেবে ব্যবহার করতে পারতাম। অন্যান্য দেশের মত সুন্দর ও সাবলীল ব্যবস্থাপনায় লেক হয়ে উঠতো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান যার নিজস্ব আয় দিয়েই রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন করা সম্ভব হতো।

।। ৭ ।।

সুইডেনে বাঙালিদের অবস্থা

হাশেম পরিবারের সকলেই শুধু দ্বীন প্রচারেই অত্যন্ত নিষ্ঠাবান নন, দ্বীনের সকল হুকুম-আহকামও পুরোপুরি ভাবে মেনে চলেন। শীতকালে দিনের আলো মাত্র কয়েক ঘন্টা পাওয়া যায় এবং তার প্রায় আধাআধি সময় নামাজের প্রস্তুতি ও নামাজ আদায়ে ব্যয় হয়ে যায় বলে আক্ষেপ করে একদিন বলছিলেন যে, মনের মত করে বোনকে স্টকহলমে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে পারছেন না। সত্যি তাই। সকাল হয় ৯ টায়। আমাদের মত সদ্য বহিরাগত বাংলাদেশীদের সূর্য উদয় ও প্রভাতের আলো

www.pathagar.com

ফুটে উঠবার পূর্বে নাস্তা করতে মন চায় না। ঘড়ি দেখে সুইডেনের অধিবাসীদের মত ভোর রাত ৭ টায় কি নাস্তা করা যায়? তাই ৯ টায়ই নাস্তা করতাম এবং তখন মনে হতো রাতের আঁধার পেরিয়ে দিনের আলো মাত্র উঁকি দিচ্ছে। সাড়ে ৯টা থেকে ১০ টার মধ্যে আমরা স্টকহলম্ দেখতে বেরুতাম এই ছিল আমাদের দৈনন্দিন রুটিন।

ঘন্টাখানেক পর যখন দিনের প্রথম গন্তব্যস্থলে পৌঁছতাম এবং এটা ওটা দেখতে শুরু করতাম তখন বেলা ১১ টা সাড়ে ১১ টা। জোহরের নামাজের সময় হয়ে আসছে বলে তখন হাশেম সাহেবের একমাত্র ফিকির হতো কোথায় নামাজ আদায় করা যায়। এতে প্রায় ৪০/৪৫ মিনিট লেগে যেত কেননা প্রায়ই আমাদের ভূনিম্ন টুনেলবানানে করে কয়েক স্টেশন পেরিয়ে মসজিদে পৌঁছতে হতো। ইত্যবসরে বেলা বয়ে প্রায় সাড়ে ১২ টায় পৌঁছে গেছে। তারপর ঘন্টাখানেকের বেশী ঘোরাফেরার আগেই আসরের ওয়াক্ত এসে যেত এবং পৌনে ৩ টায় মাগরেবের নামাজ বাসায় পড়ার জন্যে ঘরে ফেরার তাড়া থাকতো। পাঠক উপলব্ধি করবেন যে, স্টকহল্মে সারা দিনে শীতকালে বাইরের দৃশ্য দেখার জন্যে ৩ ঘণ্টার বেশী সময় পাওয়া যায় না।

হাশেম সাহেবের সাথে ঘোরাঘুরি করাতে একটা সুবিধা হলো যে, পরিকল্পিত গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্যে খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট হতো না। তাছাড়া ভিন্ন ধরনের কিছু অভিজ্ঞতা হল। দেখলাম যে বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ী ভাড়া করে স্টকহল্মে বসবাসরত বিভিন্ন মুসলিম দেশের জনগোষ্ঠী মসজিদ স্থাপন করেছেন। এরূপ বেশ কয়েকটা মসজিদে নামাজ পড়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। স্টেনটাতেই হাশেম সাহেবের বাসাসংলগ্ন তুরস্কদের দ্বারা পরিচালিত মসজিদেই দিনের শেষে ঘরে ফেরার পূর্বে আসর কিংবা মাগরেব পড়েছি। স্টেনটারই অন্য প্রান্তে বাঙালি ও পাকিস্তানীদের মসজিদে জুমার নামাজ পড়েছি। শহরের কেন্দ্রস্থলে আরবদের দ্বারা পরিচালিত মসজিদেও জোহরের নামাজ পড়ার সুযোগ হয়েছে। এসব গুলোই ভাড়া করা বাড়ী সংস্কার করে স্থানীয় তত্ত্বাবধায়কগণ ওজুর সুবিধার জন্যে ঠাণ্ডা-গরম পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয়ভাবে নামাজ ঘরটিকে উত্তপ্ত করে রাখার ব্যবস্থা এবং ঠাণ্ডা প্রশমনের জন্যে উলের মোটা কার্পেট দ্বারা মেঝে আবৃত করে রাখার সুন্দর বন্দোবস্ত করেছেন। বলাবাহুল্য বাঙালিদের মসজিদটার দীনতা লক্ষণীয় আর আরবদের মসজিদটি রীতিমত রাজকীয় হালে শহরের কেন্দ্রস্থলে বিরাজমান। এখানে আজানের আওয়াজ মসজিদের বাইরে সম্প্রচারের নিয়ম নেই। এতে অমুসলমানদের অসুবিধা হয়। তাই আজানের আওয়াজ মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। লন্ডনেও এই একই ব্যবস্থা তবে শুনেছি যে, বর্তমানে লন্ডনের কোন কোন এলাকায় স্থানীয় জনগণকে আহ্বান জানানোর জন্যে আজানের

www.pathagar.com

আওয়াজ মাইকের সাহায্যে বাইরে প্রক্ষাপণের অনুমতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন। খাস পাকিস্তানীদের মসজিদটাও মোটামুটি সুন্দর। লক্ষ্য করেছি যে, সব মসজিদেই ওয়াক্ত নামাজেও মুসুল্লিদের সমাগম ভালই হয়।

একদিন আসরের নামাজের পর স্টেনটাতে তুরস্কের মসজিদে ইলিয়াস সাহেব নামক এক সিলেটি বাংলাদেশী ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হলো। তিনি অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথেই বেশ কিছুক্ষণ আলাপ করলেন এবং তাঁর গৃহে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। সময় অভাবে তার আতিথেয়তা গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে জানতে পেরেছি যে, ভদ্রলোক বেশ কয়েক বছর ধরে সুইডেনে আছেন কিন্তু জন্মভূমির প্রতি টান এখনও পুরো মাত্রাই আছে। ইলিয়াস সাহেব বলছিলেন যে, বহিরাগতদের মধ্যে সোমালিয়া ও ইরিত্রিয়া দেশের অধিবাসীরাই বেশী নামাজী। আমিও লক্ষ্য করলাম যে, সোমালিয়া ও ইরিত্রিয়ার কচিকাঁচারা, স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরত তরুণরা, চাকরিরত যুবকগণ এবং পৌঢ় ও বৃদ্ধগণ নিষ্ঠার সাথে ধর্ম-কর্ম করে যাচ্ছে। পাকিস্তানীদের মধ্যেও পৌঢ় ও বৃদ্ধরাই বেশী নামাজী এবং সকলেই জামাতে নামাজ আদায় করে। দুঃখের সাথেই তিনি জানালেন যে, বাঙালিরাই মসজিদ আবাদ করতে চায় না। সুইডেনে কদিন অবস্থান করে বিভিন্ন মসজিদে বিভিন্ন ওয়াক্তে নামাজ পড়ে যা দেখেছি তা থেকে মনে হলো যে, ইলিয়াস সাহেবের উক্তি সঠিক।

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই তবলীগ জামাতভুক্ত। এদের শীর্ষস্থানীয় নেতা হচ্ছেন জনাব ডক্টর পিয়ার আলি। ১৯৯৬ সালের ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার জনাব পিয়ার আলির বাসায় গেলাম। যাবার পথে তারই পরিচালিত বাঙালি মসজিদে এশার নামাজ পড়ে নিলাম। নামাজের পর মসজিদে বসেই তিনি তার তবলিগী ভাইদের সাথে মশওয়ারা করে স্কুলে অধ্যয়নরত ৮ সদস্যের একটি ছাত্রদলকে ইংল্যান্ডে তবলীগী কাজে ১০ দিনের জন্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন এবং সমস্ত দায়-দায়িত্ব বন্টন করে দিলেন। আর একটা বয়স্কদের তবলীগী দলকে তিনি পাঠাচ্ছেন ফিনল্যান্ডে। এই মজলিসে কথোপকথন হলো প্রায় সবটাই উর্দুতে। ইংলিশ ও বাংলা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করল। সুইডিশ ভাষা আলোচনায় খুব একটা ব্যবহৃত হলো না। মনে হলো এই মজলিসের কর্মকর্তাগণ শতকরা ৭০ ভাগ পাকিস্তানী এবং বাকী বাঙালি। দু'একজন সুইডিশ নাগরিক ছিলেন এবং তারা সদ্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

মজলিসের পর জনাব পিয়ার আলির সাথেই আমরা তাঁর বাসায় গেলাম। দেখলাম যে তাঁর ঘরে কোন সোফাসেট বা আসবাবপত্র নেই। মেঝেতে কার্পেট বিছানো। দেয়াল ধরে কয়েকটা তাকিয়া রাখা আছে। এটাই তাঁর বৈঠকখানা অর্থাৎ

www.pathagar.com

ড্রইংরুম। জনাব পিয়ার আলি ১৯৭৩ সনে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভের জন্যে সরকারী বৃত্তি পেয়ে সুইডেনে আসেন কিন্তু সময়মত ডিগ্রী না পাবার দরুন তাঁকে সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকেই এখানে থাকতে হয়। পরে তিনি পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন কিন্তু সময়মত বাংলাদেশের মূল চাকরিতে যোগ দিতে না পারার কারণে তাঁকে চাকরিচ্যুত করা হয়। অগত্যা তিনি এখানেই থেকে যান এবং একটা ভাল চাকরি নিয়ে ক্যানাডায় চলে যান। কিছুদিন পর এরিকসন বলে একটা বিশ্ববিখ্যাত ইলেকট্রনিক কোম্পানিতে বেশ উঁচু বেতনের চাকরি নিয়ে সুইডেনে ফেরত আসেন। বর্তমানে তিনি সুইডেনে বেশ মর্যাদার সাথে উঁচু বেতনে কাজ করে যাচ্ছেন। বাঙালিদের মধ্যে তাঁকেই প্রথম দেখলাম যিনি সুইডেনের সরকারী তহবিলে সুইডিশ নাগরিক হিসেবে আয়কর দিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের ও অন্যান্য দেশের তবলীগী জামাতের সাথে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রফেসর ডক্টর মুসফেকুর রহমান (বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত তবলীগী নেতা) সাহেবের সাথেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। হাশেম সাহেব ও তার স্ত্রী সেলিনা বানু (শেলী) দের মতে, পিয়ার আলি সাহেব ও তাঁর স্ত্রীর মত নেক ও ভাল মানুষ নাকি সাধারণত দেখা যায় না। তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন শুধু দ্বীন প্রচারের জন্যে। দুনিয়ার সব ভোগ লালসা বাদ দিয়েছেন এবং যা রোজগার করেন তার সবটাই দ্বীন প্রচারের জন্যে ব্যয় করেন। তাঁর বাসায় যেয়ে প্রত্যক্ষ করলাম যে, তিনি অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করেন। এমন কি চায়ের সেট বলেও কিছু নেই। সাধারণ বাটিতে করে আমাদের চা পরিবেশন করলেন।

আলাপ-আলোচনায় পিয়ার আলি সাহেব অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র। তাঁর কাছেই জানতে পারলাম যে, সুইডেনে প্রায় ১৫০০০ বাঙালি আছে এবং তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্টকহল্‌মে থাকে। অর্থনৈতিক বিচারে বাঙালিরা অন্যান্য বহিরাগতদের তুলনায় দুর্বল। এর কারণ হচ্ছে তারা শুধু ছোট ছোট চাকরির উপর নির্ভরশীল। পাকিস্তানীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে বলে একটু ধনী। বাঙালিদের মূলধন নেই। তাই তাদের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যে ঢোকা সম্ভব হচ্ছে না। আর তা ছাড়া সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানীরা বাঙালিদের চেয়ে একটু বেশী উদ্যোগী।

তিনি আরো জানালেন যে, ইহুদী বহিরাগতরা এখানে মূলধনের বাজার (Capital Market) দখল করে বসে আছে এবং দিন দিন আরো অধিক সংখ্যায় বড় বড় ব্যবসা কিনে অধিকতর ধনী হচ্ছে। জাপানিরা এখানে বসবাস করছে না কিন্তু শিল্পে বিনিয়োগ করছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠিত শিল্প কিনে ফেলে তারা তাদের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তার করছে।

www.pathagar.com

তিনি বাঙালি ও পাকিস্তানীদের আর একটা চারিত্রিক দিক তুলে ধরলেন। তিনি বললেন যে, পাকিস্তানীরা একে অপরকে ব্যবসার ক্ষেত্রে সাহায্য করে বলে তাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সহজতর হচ্ছে। বাঙালিরা নিজেদের মধ্যকার বিভেদ, কোন্দল ও রেষারেষি নিয়েই সময় কাটায়। ধর্মের দিকেও বাঙালিদের খেয়াল কম। তিনি দুঃখ করে বললেন যে, ২৫ বছর আগে তিনি যখন এখানে এসেছিলেন তখন তবলীগের ক্ষেত্রে বাঙালিরা পাকিস্তানীদের চেয়ে অগ্রগামী ছিল। বর্তমানে বাঙালিরা হাল ও পাল বিহীন নৌকার মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভেসে চলেছে। আর পাকিস্তানীরা ধীরে ধীরে ইহকাল ও পরকালের মকসদ হাসিল করার লক্ষ্যে মঞ্জিলের দিকে এগুচ্ছে।

সমাজে একে অন্যকে সাহায্য করলে যে নিশ্চিত সুফল পাওয়া যায় তার একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৬০ দশকে গোড়ার দিকে আমার শ্বশুর সাহেব অবসর গ্রহণের পর স্থায়ীভাবে বসবাস করার মানসে গেন্ডারিয়াতে ১১০ দীননাথ সেন রোডে অবস্থিত একটি দোতলা বাড়ী কিনেন। দোতলাটা তিনি এক আগাখানি বাসন-কোসনের ব্যবসায়ীর নিকট ভাড়া দেন। সে ব্যবসায়ী প্রতিবছরই লোকসান দিতে থাকে কিন্তু তবু একই ব্যবসায়ে লেগে থাকে। তার আগাখানি সম্প্রদায়ের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণ তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরই সাহায্য করতে থাকে। এভাবে ৪ বছর লোকসান দেবার পর এই ব্যবসাতে তার অভিজ্ঞতা জন্মে এবং পরে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে বাজার দখল করেন এবং সমস্ত ধার-দেনা শোধ করে একজন ধনী আগাখানি ব্যবসায়ী বনে যান এবং স্বগোত্রীয় অন্য জনকে সাহায্য করার মর্যাদা লাভ করেন। এ হচ্ছে আগাখানিদের ধারা আর বাঙালিদের ধারা হচ্ছে একে অন্যকে টেনে নিচে নামিয়ে আনা কিংবা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া। বাঙালিরা যে পরশ্রীকাতর তা বিদেশীদেরও নজর এড়ায় না। এরূপ একটা ঘটনা যুগোশ্লাভিয়ার একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের প্রধান মিস্টার মমিরভ রসিয়ে কষিয়ে বলেছিলেন তার বিবরণ আমারই লিখিত বই 'জীবন তরঙ্গের-অর্কিডের দেশের তৃতীয় অধ্যায়ে' বর্ণিত আছে। মমিরভের গল্পটি অলীক হলেও বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আগাখানি, মাড়ওয়ারী এবং ইহুদীদের ব্যবসাটাই তাদের জীবিকার প্রধান উৎস। তাই তাদের ধৈর্য ধরে লেগে থাকতেই হয় আর ব্যবসাতে সাফল্যের মূল চাবিকাঠিও নিহিত আছে দৃঢ়তার সাথে লেগে থাকার মধ্যে। বাঙালিদের নিজস্ব পুঁজি নেই। ভাই ব্রাদার থেকে নেবে এরূপ পরিবেশ নেই তাই ব্যবসাতে টিকে থাকা তাদের পক্ষে খুবই মুশকিল। এটা সকলেই স্বীকার করে যে, বাঙালিরা বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে কারও চেয়ে হীন নয় তবু তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের মূলধনের অভাব।

www.pathagar.com

বাঙালিরা বর্তমানে দেশ-বিদেশে চাকরি করে বাংলাদেশের জন্যে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। ব্যবসাতেও তারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশের সম্পদ বাড়াতে পারতো যদি প্রাথমিক পুঁজির যোগান দেয়া সম্ভব হতো। এ ব্যাপারে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। বিদেশী রেমিটেন্সের একটা অংশ দ্বারা বাংলাদেশ সরকার শুধু বিদেশে বিনিয়োগের জন্যে একটা ব্যাংক বাংলাদেশেই স্থাপন করতে পারেন। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী উদ্যোক্তারা যদি বিদেশে বিনিয়োগ সুবিধা চান তাহলে দেশে তাদের সম্পত্তি জামানতের পরিবর্তে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিয়োগ সুবিধা এই ব্যাংক থেকে নিতে পারবেন। সরকারের সমর্থন পেলে বাংলাদেশীরা মনে বল পাবে এবং নিরাপত্তার সাথে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপনের দিকে খেয়াল দিতে পারবে। তাহলেই ইহুদী ও আগাখানিদের মত বাংলাদেশীরাও বিদেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে সক্ষম হবে এবং আরো অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশে পাঠাতে পারবে এবং দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারবে।

।।৮।।

ড্রটনিংহল্‌ম প্রাসাদ-সুইডেনের ভার্সাই

সুইডেন একটা শিল্পোন্নত দেশ। তাই এখানে প্রচুর বনভূমি থাকা সত্ত্বেও দূষিত পরিবেশের কবল থেকে দেশটি রক্ষা পায়নি। বায়ুমণ্ডলে উর্ধ্বাকাশে ভূপৃষ্ঠের ১২ থেকে ৩০ মাইলের মধ্যে অক্সিজেনের উপর সূর্য রশ্মির প্রতিক্রিয়ায় ওজোনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এভাবেই ওজোন ঘন বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে এবং সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট বিকিরণকে ভূপৃষ্ঠে আসার পথে বাধা দিয়ে আসছে। আলট্রা-ভায়োলেট বিকিরণ মানব দেহে ক্যান্সার রোগ ঘটায়। তাই ওজোন ঘন স্তর মানব কল্যাণের জন্যে অতি প্রয়োজনীয়।

১৯৭০ দশকে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে, সুইডেনের আকাশে শুধুমাত্র ওজোন স্তর পাতলা হয়ে যাচ্ছে না, কোন কোন স্থানে নিঃশেষ হয়ে গিয়ে বেশ বড় আকারের ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সূর্যের তেজস্ক্রিয় রশ্মি সরাসরি সুইডেনে নেমে আসছে। এ নিয়ে সুইডেনবাসীরা এবং পার্শ্ববর্তী ইউরোপীয় দেশ-সমূহ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বের করেছেন যে, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বলে রাসায়নিক গ্যাস যা রিফ্রিজেরেটর ও এয়ারোসোলে (মশা মাছি ও কীটনাশক পদার্থ) ব্যবহৃত হয়, তা বায়ু থেকে হালকা বলে নির্গত হবার পর বায়ুমণ্ডলে উপরে

www.pathagar.com

উঠে যায়। এই গ্যাসের ক্লোরিন উপাদানটি ওজোনকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। এর ফলে ওজোন স্তরের ঘনত্ব কমে যাচ্ছে এবং ক্ষতিকারক সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ভূপৃষ্ঠে অধিক পরিমাণে নিপতিত হয়ে ত্বক ক্যান্সার ও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্টকারী চোখের রোগ বৃদ্ধি করছে। তাছাড়া আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি অক্সিজেন সৃষ্টিকারী প্লাংকটন জীবাণু ধ্বংস করছে। এর ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিশ্বের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলেই এর প্রভাব বেশী। বিজ্ঞানীরা সুইডেনের আকাশেই শুধু প্রায় ৫০ মাইল ব্যাসের এক ছিদ্রের সন্ধান পেয়েছে।

পৃথিবীটাকে আমাদের জন্যে বাসোপযোগী রাখতে হলে এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে একটা সুস্থ বাসভূমি রেখে যেতে হলে বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে মশা, মাছি ও কীটনাশক পদার্থের ব্যবহার যথা এয়ারোসলের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। এয়ারোসলে রাসায়নিক পদার্থ ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সি এফ সি) থাকে তাই বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহে সি এফ সি'র ব্যবহার আইন করে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর আমাদের দেশে এর ব্যবহার আরো বেশী করার জন্যে ঘটা করে রেডিও-টেলিভিশনে অ্যাডভার্টইজ করা হচ্ছে। ১৯৮৭ সনে মনট্রিলে ৩৬ টি দেশ, একটি চুক্তিবলে, সি এফ সি'র ব্যবহার বন্ধ করতে সম্মত হয় এবং ডিসেম্বর ১৯৯৫ সনে বর্তমান বিশ্বের ১০০টি দেশ কীটনাশক পদার্থ মিথাইল ব্রোমাইড উৎপাদন বন্ধ করে দিতে সম্মত হয়। ১৯৯১ সন থেকে ন্যাশনাল এয়ারোনটিক্স ও স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (N.A.S.A.) মহাশূন্যে উপগ্রহ দ্বারা ওজোন স্তরের উপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে, উত্তর গোলার্ধের গ্রীনল্যান্ড থেকে শুরু করে পশ্চিম সাইবেরিয়ার অনেক স্থানেই ওজোন স্তরের ঘনত্ব মারাত্মকভাবে কমে গেছে। উন্নত বিশ্ব এর পরিণাম সম্বন্ধে সজাগ, তাই ওজোন বিনষ্টকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন ২০২০ সাল নাগাদ বন্ধ করে দেবে বলে তাদের সংকল্প ব্যক্ত করেছে। তাছাড়া বনায়নের মাধ্যমে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ খর্ব ও অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টাও চালাবে। আমরা রাসায়নিক দ্রব্যাদি তৈরি করি না বটে কিন্তু উন্নত বিশ্বে মানব কল্যাণে যে সমস্ত পদার্থের উৎপাদন ক্ষতিকর বলে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে সে সমস্ত পদার্থ উৎপাদনের অনুমতি আমরা আমাদের দেশে দিয়ে যাচ্ছি। উন্নত বিশ্ব তাদের অর্থনৈতিক লোকসান আমাদের দেশ থেকে তুলে নিচ্ছে। আমরা অনুন্নত হতে পারি, দরিদ্র হতে পারি কিন্তু সচেতনতাও থাকবে না এটা ঠিক নয়। আমরা আমাদের সাধ্যমত সুন্দর ভুবনকে সুন্দরতম করতে চেষ্টা করতে থাকবো এটাই হবে জাগ্রত বিশ্ববাসী হিসেবে আমাদের কর্তব্য।

www.pathagar.com

ফিরে আসি সুইডেনের পথে। শহরে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর আজ ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সুইডেনের রাজার বাড়ী দেখতে গেলাম। সিটি সেন্টার থেকে মাইল ১৫ পশ্চিমে অবস্থিত ড্রটনিংহল্‌ম রাজপ্রাসাদটি লেক মেলারেনের একটি ছোট দ্বীপে মনোরম পরিবেশে অবস্থান করছে। রাজা চার্লস গুষ্টাভাস XVI এবং রাণী সিলভিয়া, তাদের তিন সন্তান নিয়ে সুইডেনের অধিবাসীদের মতে, রাজকীয় আড়ম্বরতা পরিহার করে অতি শান্তিতে এই প্রাসাদে নিশ্চিন্তে বসবাস করছেন। শুনেছি রাজা সাইকেলে করে রাস্তায়ও বেরিয়ে পড়েন,। কখনও কখনও নাকি সাধারণ পোষাক পরিহিত অবস্থায় তাঁকে তার প্রাসাদের সামনে ময়দানে পায়চারি করতেও দেখা যায়। তিনি নির্বিবাদী, তার কোন শত্রু নেই। জ্যেষ্ঠ কন্যা ভিক্টোরিয়া, তিনিই বর্তমান রাজার উত্তরাধিকারী-ভবিষ্যতের রাণী। তাঁর কিছুদিনের ছোট ভাই চার্লস ফিলিপ উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা হতে পারবেন না। সুইডেনে উত্তরাধিকারী হয় জ্যেষ্ঠ সন্তান সে পুত্রই হউক কি কন্যাই হউক। সর্বকনিষ্ঠ-কন্যা মেডিলিয়েন সকলেরই সোহাগী। ছোট সুখী পরিবার। ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারে জন্মসূত্রে জ্যেষ্ঠ পুত্র হয় উত্তরাধিকারী। যদি সন্তানদের মধ্যে কোন পুত্র না থাকে তবেই শুধু কন্যা উত্তরাধিকারী সূত্রে রাজত্ব পেয়ে থাকে।

হাশেম সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা রিতাকে আজ আমাদের পথ প্রদর্শক হিসেবে নিলাম। রাজার বাড়ী যে দ্বীপটিতে অবস্থিত সেখানে নৌকাযোগেও যাওয়া যায় আবার ভূনিম্ন রেলপথ ধরেও যাওয়া যায়। আমরা ভূনিম্ন রেলপথ ধরে ব্রম্মাপ্লান নামক স্টেশনে গেলাম এবং সেখান থেকে বাস ধরে ড্রটনিংহল্‌ম রাজপ্রাসাদের সামনে নামলাম। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের ভার্সাই রাজপ্রাসাদের অনুকরণে নির্মিত এই প্রাসাদটি বর্তমান রাজ পরিবারের বাসস্থান। দুদিকে মেলারেন হ্রদ তার গাঢ় নীল বাহু দ্বারা দ্বীপটিকে আলিঙ্গন করে রেখেছে আর দূরে হ্রদের অপর পারের পাহাড়সমূহ প্রহরীর মত প্রাসাদটির উপর নজর রাখছে।

আমরা যেদিন পৌঁছলাম সে দিন রাজপ্রাসাদের কর্মকাণ্ড ছিল খুবই কম। মনে হচ্ছিল ঘুমন্ত পুরীতে পৌঁছে গেছি। গ্রীষ্মে শুনেছি এখানে হাজার হাজার পর্যটকের সমাগম হয় এবং শীতকালে মনে হয় প্রাণহীন প্রাসাদটি চেতনহীন অবস্থায় রয়েছে। আমরা প্রধান ফটক পার হয়ে রাজবাড়ীর অঙ্গনে পৌঁছলাম। কেউ কোন বাধা দিল না, কোন জিজ্ঞাসাবাদও করল না। আমরা একটু ইতস্ততঃ করছি এমন সময় দেখলাম যে, দুটো গাড়ী এসে থামলো এবং প্রহরীরা তাদের প্রথামত অভ্যাগতদের সালাম ঠুকলো এবং প্রাসাদের ভেতর থেকে দু'তিন জন কর্মকর্তা এসে অভ্যাগতদের সংবর্ধনা জানালো এবং সসম্মানে পথ দেখিয়ে প্রাসাদ ভবনের অভ্যন্তরে নিয়ে গেল।

www.pathagar.com

আমরা চত্বর পেরিয়ে কয়েক ধাপ নিচে প্রাসাদ বাগানে নামলাম। একটা জলাধার রয়েছে এবং তার মধ্যখানে এক নিষ্ক্রিয় ফোয়ারা উদাস দৃষ্টি মেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চারিধার নিথর, নীরব ও নিশ্চুপ। বিশাল দৈত্যপুরীতে আমরা যেন অনধিকার প্রবেশকারী। দূরে প্রাসাদের কোণে কোণে লম্বা টুপি পরিহিত প্রহরীরা মূর্তির মত দণ্ডায়মান। ভারী ওভারকোটে আচ্ছাদিত মুখমণ্ডলীর সম্মুখভাগ ছাড়া আর সবই ঢাকা। হাতদ্বয়ে পুরো দস্তানা, তবু মনে হয় যেন শীতে জমে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর পরই প্রহরীরা সতর্ক অবস্থায় এসে বন্দুক উঁচিয়ে দৃঢ় কদমে টহল দিচ্ছে। টহলশেষে পূর্ব স্থানে ফিরে এসে আবারও মূর্তিবৎ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই রুটিন চারদিকের সকল সেন্ট্রিরাই কিছুক্ষণ পরপরই করছে। আমার বেগম সাহেবা কৌতুক করে বললেন, প্রহরীরা শীতে জমে যাচ্ছেতো তাই একটু হাত-পা নেড়ে শরীরটাকে চাঙ্গা করে রাখার জন্যে এই অনুশীলন করছে। কথাটা ফেলে দেবার মত নয়। হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রায় প্রাসাদের কোণে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলে জমে কাঠ হয়ে যাবে এতে সন্দেহ নেই।

ড্রটনিংহলম প্রাসাদের বাগানে লেখক ও তাঁর পত্নী

ড্রটনিংহল্‌ম প্রাসাদের বাগানটি তিনটি স্তরে ধাপে ধাপে প্রাসাদ ভবন থেকে নিচে নেমে গেছে। সামনেই প্রথম স্তরে মাঠ ও ফোয়ারা। প্রশস্ত পায়ে চলার ছায়া বীথিতে রঙ্গিন কাঁকর বিছানো পথ এবং মখমল সবুজ ঘাসে আবৃত উদ্যান অসীম শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। আমরা প্রায় ঘন্টাখানেক বাগানে হাঁটলাম কিন্তু একটি জনপ্রাণীকেও দেখলাম না।

www.pathagar.com

ফিরে যাবার প্রাক্কালে সেন্ট্রিকেই জিজ্ঞেস করতে সে জানাল যে, বর্তমানে প্রাসাদে প্রবেশ নিষিদ্ধ আছে। তাই প্রাসাদে ঢুকবার সুযোগ পেলাম না। শুনেছি যে প্রাসাদের অভ্যন্তরে চাইনিজ প্যাভেলিয়নটা দেখবার মত বিশেষ করে অলঙ্কারবহুল অষ্টাদশ শতাব্দীর আসবাবপত্র যার মাধ্যমে চীন দেশের কৃষ্টির প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। শীতকালে গিয়েছি বলে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন বিশ্ববিখ্যাত ড্রটনিংহল্‌ম কোর্ট থিয়েটার দেখতে পারিনি এবং দেখা হয়নি কোন ব্যালে নাচ, নাটক কি থিয়েটার।

ড্রটনিংহলম রাজ প্রাসাদের সম্মুখে নাজমা রহমান ও রিতা

ভার্সাই-এর অনুকরণে এই রাজপ্রাসাদটি তৈরি করা হয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে। তাই এই প্রাসাদটিকে সুইডেনের ভার্সাই বলা হয়।

প্যারিস থেকে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা যাবার পথে ফ্রান্সের ভার্সাই রাজপ্রাসাদটি দেখবার সুযোগ হয়েছিল ১৯৫৮ সালের মে মাসে। জীবনে চলার পথে বিভিন্ন দেশে অনেক রাজপ্রাসাদ দেখেছি তবে ভার্সাই ছিল অনন্য। ভার্সাই-এর মননশীল পরিবেশ, বৃহৎ উদ্যানে সুরুচিসম্মত ভাবে স্থাপিত মূর্তিসমূহ, প্রাণবন্ত প্রস্ফুটিত ফোয়ারা সমূহ, ঐতিহাসিক পটভূমি ভার্সাইকে চিরতরে বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজপ্রাসাদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

ভার্সাই প্রাসাদ ড্রটনিংহল্‌ম প্রাসাদ থেকে অনেক বড় এবং ঐতিহাসিক বিবেচনায়ও অনেক সমৃদ্ধ। ফরাসী সম্রাট লুই XIV ১৬৮২ খৃস্টাব্দে প্রাসাদ তৈরির কাজ সম্পন্ন করার পর সম্রাটের সদর দপ্তর প্যারিস থেকে ভার্সাইতে স্থানান্তরিত

www.pathagar.com

করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই ভার্সাইতে ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ার যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজয়ের পর ১৮৭১ সালে এই প্রাসাদের কাঁচঘরে (Hall of Mirrors) রাজা উইলিয়ম - I কে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাট ঘোষণা করা হয় এবং এই কাঁচঘরেই ১৯১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং যার ফলে লীগ অব ন্যাশন্‌সের জন্ম হয়।

ড্রটনিংহল্‌ম রাজপ্রাসাদের বাগানে হাঁটছি আর মনে হচ্ছে যে, একদিন সুদূর অতীতে কত না জন নির্মল আনন্দ লাভের জন্যে এই বাগানে পায়চারী করেছে, হেসেছে, খেলেছে; আবার কত না জন ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে, পালিয়ে বেঁচেছে। রাজপুরীর সে রহস্য সামান্য কিছু রাখা থাকে আর বাকী সবটাই ঢাকা থাকে, নিমজ্জিত হিমশীলার মত, চোখের আঁড়ালে, অজানা। ড্রটনিংহল্‌মের হলের রহস্য ভাণ্ডার ভার্সাই-এর তুলনায় হয়ত নগণ্য তবু এটা একটা প্রাসাদ তাই গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

।। ৯ ।।

সামাজিক যৌনাচার

মিসেস হাশেম একদিন ইচ্ছে প্রকাশ করলেন যে, তিনি আমাদের বাইরে কোথাও আপ্যায়ন করবেন। প্রত্যেক দিন এবং প্রত্যেক ওয়াক্ত তিনি নানা ধরনের রান্না-বান্না করছেন এবং আমাদেরই পরিচর্যার জন্যে নানা জাতীয় ফলমূল টেবিলে এনে জড়ো করছেন তারপরও তিনি আমাদের আপ্যায়ন করতে চান। ব্যাপারটা তাই একটু হেঁয়ালি মনে হলো। তিনি কি ভাবছেন যে, আমরা তাঁর বাসার খাবার পছন্দ করছি না? আমরা স্থির করলাম যে, আমরা কোথাও খেতে যাব না তখন তাঁকেই পরিষ্কার করে বলতে হল যে, তিনি আমাদের খাবার দাওয়াত দিচ্ছেন না। আগেই বলেছি যে শেলীর সব কর্মকাণ্ডেই একটা পবিত্রতার ছাপ আছে এবং তিনি সেটা ধরে রাখতেই চেষ্টা করেন। খেতে নিয়ে যাবেন না তবে কোথায় আমাদের আপ্যায়ন করবেন? ব্যাপারটা আমাদের নিকট রহস্যজনক মনে হচ্ছে। শেলী আমাদের একটু খেলিয়ে বললেন যে, তিনি আমাদের কসমোনোভাতে নিয়ে যাবেন এবং তিনি ইতোমধ্যেই টিকেট কেটে ফেলেছেন আমরা যে ছবি দেখব তা হচ্ছে Cosmic Science-এর উপর। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ভিত্তিক একটি ছবি যা বহির্বিশ্বের গ্রহ, উপগ্রহ, সৌরমণ্ডল, তারকা জগত এবং বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য তত্ত্ব সম্বন্ধে ৪৫ মিনিট ধরে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে বিশাল অর্ধগোলাকার পর্দায় দেখানো হবে। শেলী বলল যে, আমরা খুব উপভোগ করব। দ্বিতীয় ছবিটি হবে Mystry of Ocean. মহাসমুদ্রের রহস্য, সমুদ্রের স্রোতধারা ও তরঙ্গ, সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও

www.pathagar.com

জীবজন্তু, সমুদ্রের অসীম তেজ ইত্যাদি নিয়ে ৪৫ মিনিটের আর একটি ছবি। দুটোই শিক্ষামূলক ছায়াছবি। শেলী আগ্রহভরে বললো "দুলাভাই, নতুন কিছু দেখবেন নতুন ধরনের সিনেমা হলে এবং আমার বিশ্বাস যে, আপনাদের বেশ ভাল লাগবে।" অগত্যা শেলীর ব্যবস্থাপত্র ও নির্দেশ মেনে নিয়ে আমরা আগ্রহভরে কসমোনোভার জন্যে অপেক্ষায় রইলাম।

নির্দিষ্ট দিনে সিনেমা শুরু হবার প্রায় ৪৫ মিনিট আগে আমাদের রওয়ানা হবার কথা। আমি ও হাশেম সাহেব তৈরি হয়ে গেলাম কিন্তু মহিলারা বিশেষ করে রীতা ও সেগুপ্তা তাদের চিরাচরিত শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির জন্যে সময় নিতে থাকলো বেশী। অগত্যা স্থির হলো যে, হাশেম সাহেব ও আমি প্রথম চলে যাব এবং মেয়েরা তৈরি হয়েই চলে আসবে। কিভাবে কোথায় যেতে হবে তা হাশেম পরিবারের সকলেই জানে তাই অসুবিধা মোটেই হবে না।

রাস্তায় যেতে যেতে হাশেম সাহেবের নিকট এ দেশের পারিবারিক জীবনের একটা চিত্র পেলাম। এ দেশের স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে যখন খুশি মিলতে পারবে, যেখানে খুশি যেতে পারবে এবং একত্রে রাত কাটাতে পারবে। কোন সামাজিক শাসন-অনুশাসন তাদের অভিপ্রায়ের পথে বাধা হতে পারবে না। তবে ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই সম্মতি থাকতে হবে। জোর করে উঠিয়ে নিয়ে গেলে আইনত দণ্ডনীয় হবে। সুইডেনবাসীরা যৌন মিলনকে লুকোচুরির ব্যাপার মনে করে না বরং প্রয়োজনীয় চাহিদা হিসেবেই দেখে। তাই অবাধ যৌন মিলনকে সরকার সমর্থন করে। কিছুদিন একই ঘরে একই সাথে থেকে প্রয়োজন শেষে তারা আলাদা হয়ে যেতে পারে এবং অন্যত্র যেয়ে নূতন ভাবে নূতন জোড় বাঁধতে পারে এবং নূতন সংসার গড়ে তুলতে পারে।

এই স্টকহল্‌ম শহরেই কিছুদিন আগে যে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল তার বিবরণ হাশেম সাহেব দিলেন। একই বাড়ীতে একই ছাদের তলায় বাবা-মা, এক ভাই ও তার বোন বাস করত। এক সাথে থাকতে থাকতে বড় ভাই ও বোনের মধ্যে যৌন সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই বোনটি গর্ভধারণ করে। এ দেশের সমাজটাই এমন। বাবা-মা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাই ছেলে মেয়েদের অবাধ মেলামেশার ফল কি হতে পারে তা উপলব্ধি করলেও সে দিকে খেয়াল দেবার সময় তারা পায় না। যাই হোক এই গর্ভধারণে কি কেউ লজ্জিত কিংবা ধিকৃত হয়েছিল? মোটেই না। বরং এই খবর যখন জানাজানি হলো তখন সমাজের সকল স্তরের লোক তাদের অভিনন্দন জানাল। এই যুগলটি স্বাধীনচেতা ও সৎ সাহসের ধারক হিসেবে প্রশংসিত হয়েছিল। বাপ-মার বলবার কিছুই ছিল না। হয়তবা বাধ্য হয়ে তারাও এ ধরনের নব সংস্কৃতি মেনে নিয়েছে। আমাদের দেশে

www.pathagar.com

হলে হয়ত বাবা-মা লজ্জায় আত্মহত্যা করত অথবা দেশত্যাগী হতো, কিন্তু সুইডেনে এই ব্যাপারটিকে এমনভাবে দেখা হলো যে, যৌন প্রয়োজন ঘরেই মিটিয়েছে সুতরাং অসুবিধা কোথায়? সামাজিক সংস্কার থেকে মুক্ত হবার পথ দেখিয়েছে বলে সে ভাই ও বোন নূতন ধরনের রোমিও ও জুলিয়েট হিসেবে প্রশংসার দাবীদার। নতুন দম্পতি সরকারী অনুদান পেল, বাড়ী ও গৃহসামগ্রী যাতে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে সংসার পাততে পারে।

"Living together" অর্থাৎ অবিবাহিত অবস্থায় একত্রে বসবাস করা এখানে কোন দোষের ব্যাপার নয়। এ ভাবে বসবাস করাটা স্বল্পকালীন সময়ের জন্যেও হতে পারে আবার বহু দিনের জন্যেও হতে পারে। যৌন সম্ভোগের জন্যে একটি সন্ধ্যার সহ-অবস্থান মোটেই দৃষ্টিকটু নয় এবং আইনগত দিক থেকেও অবৈধ নয়। এই অবাধ মেলামেশার স্বাধীনতা থাকার জন্যে রাস্তাঘাটে তাদের ছেলে মেয়েদের একে অপরের সাথে চিপটে থাকা কিংবা জনসমক্ষে ভালবাসার উগ্র বহির্প্রকাশ, দৃষ্টিকটু অসামাজিক আচরণ, খুনসুটি ও অত্যধিক মাখামাখি করা ইত্যাদি নজরে আসে না যেমন অহরহই দেখা যায় ইংল্যান্ডে পার্কের আনাচে-কানাচে, বাস স্টপেজে, সিনেমা হলে এবং খোলা রাস্তার ধারে জনসমক্ষে। সুইডেনের তরুণ-তরুণীরা এ দিক থেকে বেশ ভদ্র আচরণ করে থাকে এমন কি জড়িয়ে ধরে চলার রীতিও বোধ হয় এখানে নেই। অন্তত আমি যে কদিন সুইডেনে ছিলাম রাস্তা ঘাটে প্রেমের বহিঃপ্রকাশ দেখিনি। আর প্রয়োজনই বা কি? যৌন মিলনের পথে যখন কোন বাধাই নেই তখন পথে-ঘাটে; বাসে-ট্রেনে কিংবা বাজারে-স্টেশনে অকারণে ফুচ্‌কো মিলনের চেষ্টা করতে যাবে কেন?

হাশেম সাহেব বললেন যে, অবিবাহিত অবস্থায় একত্রে বসবাস করা বর্তমানে সুইডেনে অত্যন্ত প্রচলিত প্রথা। বিয়ে হয়নি বলে সম্পত্তি ভাগাভাগির প্রশ্ন আসে না। কিন্তু যে মুহূর্তে এই যুগলটি সন্তান সম্ভবা হলো তখন কিন্তু দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে যাওয়া যায় না। বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত অবাধ মেলামেশাতে কারও কোন আপত্তি থাকবে না কিন্তু যেই সন্তান পেটে এলো তখন সরকারী যন্ত্র সচল হয়ে উঠলো। শিশুকে রক্ষা করার দায়িত্ব তখন থেকেই সরকার গ্রহণ করল। এই মুহূর্তে যদি বাবা-মা বিচ্ছিন্ন হতে চায় তখন শিশুটি ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত এবং শিশুটিকে রক্ষা করার দায়-দায়িত্ব বন্টনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের স্থির মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হতে পারবে না। বাচ্চাটির দায়িত্ব অবশ্যই একজনকে সন্তুষ্ট চিত্তে নিতে হবে। মা অবশ্যই দু'বছর পর্যন্ত পালবে এবং বাবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে।

যৌন সম্ভোগটাই যাদের লক্ষ্য তারা ঘটা করে বিয়ে করে সে অভাব মেটানোর প্রয়োজন মনে করে না। ঝামেলামুক্ত থাকার জন্যেই অবিবাহিত অবস্থায় একত্রে

www.pathagar.com

বসবাস সমাজ স্বীকৃত। যে কোন নাগরিকের নিম্নোক্ত চারটি সামাজিক অবস্থানের যে কোন একটি থাকতে হবে:

১. বিবাহিত এবং একত্রে বসবাসরত। (আমাদের দেশীয় প্রথামত। তাদের দেশের সনাতন প্রথাও তাই ছিল।)

২. বিবাহিত ছিল কিন্তু বর্তমানে বিচ্ছেদের পর একা নারী কিংবা একা পুরুষ হিসেবে বসবাসরত। ছেলে পুলে থাকলে তার দায়িত্বভার যে কোন একজনের উপর ন্যস্ত হবে। এই ধরনের পিতা কিংবা মাতাকে Single parent অর্থাৎ একক পিতা-মাতা বলা হয়।

৩. অবিবাহিত ছিল এবং বর্তমানেও আছে।

৪. অবিবাহিত একত্রে বসবাসরত। এরূপ যুগল নারী-পুরুষ হতে পারে ; আবার পুরুষ-পুরুষ কিংবা নারী-নারীও হতে পারে। যে অবস্থাতেই থাকুক সেটা সমাজ ও রাষ্ট্র স্বীকৃত।

এখানে পুরুষ ও পুরুষের মধ্যে বিয়ে হয় এবং একত্রে বসবাস করে এবং যৌন মিলন উপভোগ করে। এবং অনুরূপভাবে নারী-নারীতেও বিয়ে হয় এবং তারাও তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যৌন মিলন উপভোগ করে। তাদের উপভোগের গাঢ়ত্ব কতটুকু তা শুধু তারাই বলতে পারবে তবে সমকামীদের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরার প্রচেষ্টায় ইংল্যান্ডের টেলিভিশনের 'কিলরয় শো' বলে একটি সাপ্তাহিক টি ভি সিরিজের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এই অনুষ্ঠানটি আমি লন্ডনে বসে ১৯৯৬ সনের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় দেখেছিলাম। 'কিলরয় শো' বহু বছর ধরে 'বি বি সি' টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। মূলত সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনার সভা হচ্ছে এটা। প্রতি সপ্তাহে সকাল ১১ টার দিকে আধা ঘন্টার জন্যে এই অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়। আমি যে অনুষ্ঠানটির উল্লেখ করছি তা ছিল 'সমকামীদের চেতনা'-এর উপর। এতে কিছু বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ অতিথি উপস্থিত ছিলেন আর তাছাড়া ৩০/৪০ জন অংশগ্রহণকারী জনসাধারণ উপস্থিত ছিল। বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত পেশ করা হয়ে থাকে এই অনুষ্ঠানটিতে। পরিচালনায় ছিলেন 'কিলরয়' বলে একজন প্রখ্যাত প্রযোজক। এক দর্শক মন্তব্য করল যে, নারী-পুরুষের মিলনের মধ্যে একটা মাদকতা আছে, গভীর কামনাদীপ্ত মিলনাকাঙ্ক্ষা আছে এবং শারীরিক, মানসিক উন্মাদনা ও উত্তেজনা আছে। পুরুষে-পুরুষে মিলনে কিংবা নারীতে-নারীতে মিলনে কি সেরূপ কোন অনুভূতি জাগ্রত হয়? সমকামিতায় হয়ত বা যৌন চাহিদা মিটে যায় কিন্তু গভীর আত্মহারা আনন্দ কিভাবে পাওয়া যায়

www.pathagar.com

তা তিনি মোটেই উপলব্ধি করতে পারছেন না। তিনি এটাকে একটা অস্বাভাবিক, উদ্ভট ও বিকৃত যৌনক্রিয়া বলে অভিহিত করেন।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল কয়েকজন সমকামী এবং তাদের মধ্যে একজন পুরুষ। বলল যে, আপনি নারী-পুরুষ মিলনের মধ্যে অকল্পনীয় সুখ উপভোগ করেছেন এটা না হয় মানলাম কিন্তু আপনি কি পুরুষ-পুরুষের মিলনের স্বর্গীয় সুখ কখনও উপভোগ করেছেন? নিশ্চয়ই না। অন্তত আপনার কথা থেকে তা মনে হয় না। তাহলে পুরুষ-পুরুষের মিলনে এবং সহ-অবস্থানে যে গভীর আনন্দ ও সুখ আছে আপনি তা কিভাবে জানবেন? তাই আপনার বিরূপ সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এবারে নারী-নারী সমকামীদের একজন বললেন যে, যৌন মিলন সুখ নারী-নারীদের মধ্যেও হয় এবং তা অত্যন্ত উপভোগ্য হয়। তিনি মনে করেন যে সোহাগ, সম্প্রীতি এবং নির্ভাবনায় তারা বসবাস করে তা চিরন্তন স্বর্গীয় এবং তাদের দৈহিক মিলনও হয় অত্যন্ত ঈপ্সিত।

ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ে সমকামিতা নিকৃষ্ট ধরনের পাপ বলে গণ্য করা হত। আর আজ এর পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ শোনা যায়। ইউরোপ ও আমেরিকাতে সমকামিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমান বিশ্বের কোন কোন দেশে সমকামিতা আইনত স্বীকৃত। সুইডেনে সমকামীদের মধ্যে বিয়ে হয়। ইংল্যান্ড ও আমেরিকাতে তারা সমাজে একত্রে বসবাস করে এবং টেলিভিশনে দেখেছি যে, একজন নম্র প্রকৃতির মেয়েলি স্বভাবের এবং অন্যজন কর্তৃত্ববাদী হয়ে থাকে। মেয়েদের মধ্যেও তাই হয়। নাটক, নভেলে হয়ত অনেকে পড়েছেন যে, জেলখানায় সমকামিতার প্রসার বেশী। অল্পবয়েসী সুশ্রী কয়েদী যদি সাধারণ সাজা পেয়ে খোলা জেলে যায় তাহলে তাকে পাবার জন্যে দীর্ঘদিন যৌনসুখ বঞ্চিত পুরানো কয়েদীদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা লেগে যায় কে তাকে দখল করবে। তখন পালের গোদা তাকে নিজ ছত্রছায়ায় আশ্রয় দিয়ে তার হেরেমে আর একজন পুরুষ সমকামীর সংখ্যা বাড়ায়। এ ধরনের আচরণ মেয়েদের জেলেও লক্ষ্য করা যায়। শক্তিশালী ষণ্ডা মার্কা নারী সুন্দরী, নমনীয় সদ্য আগত কয়েদিনীকে নিজ দখলে রেখে উপভোগ করে থাকে।

সুইডেনের সমাজ জীবনের এই দিকটার কথা বলতে বলতে আমরা এক সময় কসমোনোভার নিকটবর্তী হলাম। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন অনুষ্ঠানটি শুরু হবার ঘন্টা বেজে গেছে। আমরা আমাদের ফেলে আসা সাথীদের জন্যে আর একটু অপেক্ষা করার পর হাশেম সাহেব আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে তিনি নিজে অন্যদের জন্যে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

www.pathagar.com

আলো থেকে ধীরে ঘোরা পথে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেলাম। অনুভব করছি পায়ের নিচে আছে পুরু কার্পেট। যতই এগুচ্ছি অন্ধকারের ঘনত্ব ততই বাড়ছে আর শুনতে পাচ্ছি নভোমণ্ডলের দূর থেকে ভেসে আসা ভৌতিক তরঙ্গায়িত রহস্য মিশ্রিত ধ্বনি। কোন দরওয়াজা পার হলাম বলে মনে হল না কিন্তু পৌঁছে গেলাম কালো কুয়াশার রাজত্বে। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আর সেই মুহূর্তে আকাশ বাতাস ফাটানো এক ধ্বনিতে আঁতকে উঠলাম এবং সাথে সাথে এক ঝলক বিদ্যুত খেলে গেল। মুহূর্তের আলোতে দেখতে পেলাম যে, আমার ডান পাশে অর্ধ গোলাকার খাড়া পাহাড়ের গুহায় দর্শনার্থীরা বসে আছে। হ্যাঁ... হলটা অনেকটা গোলাকার। ছাদটা গম্বুজের মত এবং শুধু পেছনটা ছাড়া সামনে, উপরে, ডানে ও বাঁয়ে সবটা মিলেই পর্দা। কোন একটা দিকে নজর রাখলে অন্য দিকে সংঘটনশীল অনেক ঘটনা নজর এড়িয়ে যাবে। বাস্তব জীবনেও তাই হয়। তাই বাস্তবতা প্রস্ফুটনের জন্যে এই ধরনের বৃহৎ পর্দার উদ্ভাবন, আলোক চিত্র জগতে নূতন আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। আমি এই ধরনের পর্দা প্রথম দেখেছিলাম জাকার্তার "সুন্দর মিনি ইন্দোনেশিয়া" নামক পার্কের থিয়েটার ঘর "সোনালী সংঘে" ১৯৯৩ সালের ৪ সেপ্টেম্বর, যখন ইসলামিক কমন মার্কেটের ব্যবস্থাপনার জন্যে আমি ইন্দোনেশিয়া যাই। আমারই "জীবন তরঙ্গ" বই-এর 'অর্কিডের দেশে' এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে সোনালী সংঘের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

একটু পরেই অনুষ্ঠানটি শুরু হবে তাই অন্ধকার হাতরে যতটা সম্ভব দ্রুত এগিয়ে চললাম। একটু পরই দেখলাম খুবই খাড়া সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে এবং তা বেয়েই ধীরে ধীরে প্রায় ৪০ ফিট উপরে ওঠার পর আসন পেলাম। চারদিকে অন্ধকারের সাথে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চোখ সমন্বয় সাধন করে ফেলল। দেখতে পেলাম অপূর্ব রূপ। এ ধরনের সিনেমায় অনেকগুলো প্রজেক্টরকে একই সাথে বিভিন্ন স্থানে ফোকাস করা হয়ে থাকে এবং সব গুলোকে এমন ভাবে সমন্বিত করা হয় যেন মনে হয় চারদিক ব্যাপৃত একটা ছবি।

আজকে তিনটি ফিল্ম দেখানো হবে। প্রথমটি হচ্ছে "কসমিক সায়েন্স" সুইডেন ভাষাতে ধারা বিবরণী দেয়া হচ্ছে কিন্তু আমাদের জন্যে "ইয়ার ফোনের" ব্যবস্থা থাকায় যন্ত্রটি কানে দিয়ে

মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র, সূর্য, গ্রহতারা ছাড়ি'
ভূলোক, দ্যুলোক, গোলক, ভেদিয়া.........

www.pathagar.com

আমরা পৌঁছে গেলাম সেই অতীতে যখন "The Big Bang" মানে মহাবিশ্বে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটেছিল এবং যা থেকে সৌরমণ্ডল সৃষ্টির এবং মহাবিশ্বের বিস্তৃতির শুরু হয়েছিল। এই বিস্ফোরণ তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমাদের কানে লাগানো ইয়ার ফোনে ইংরেজী ভাষ্যে আমরা শুনতে থাকলাম। সর্বক্ষণই মনে হচ্ছিল মহাকাশ ভ্রমণে বেরিয়েছি এবং প্রচণ্ড গতিতে নভোমণ্ডলে, ছায়াপথে এবং নীহারিকা রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

অনুষ্ঠানটির শেষে বেরিয়ে এসে দেখলাম হাশেম সাহেব আমার অপেক্ষায় রয়েছে। আমি কিছু বুঝবার আগেই তিনি আমাকে নিয়ে আবারও হলের ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমরা দেখলাম Mystry of the Sea 'সমুদ্রের রহস্য'। একদম পেছনের সারির মাঝামাঝি জায়গাতে দেখলাম আমাদের পরিবারের সদস্যগণ বসে আছে। এ ছবিটাও ভাল। সাগরের অতল জলে কত যে রহস্য লুক্কায়িত আছে তা আমরা কজন জানি। সমুদ্রের তলদেশে কোন কোন স্থানে গভীর সামুদ্রিক গাছের জঙ্গল রয়েছে। রয়েছে কোরালের বনভূমি যেখানে নানা রঙের এবং নানা ধরনের কোরালসমূহ শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করে জল নিম্নে এক অপূর্ব মোহময় বিশ্বের সৃষ্টি করে রেখেছে। সামুদ্রিক কীটের অস্থি ধীরে ধীরে জমা হয়ে হাজার হাজার বছরে যে পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায় তাকেই কোরাল বলে। একটার উপর আর একটা মৌমাছি বসে যেমন একটা মৌচাকের সৃষ্টি হয় তেমনি সামুদ্রিক কীটও একটার উপর আর একটা বসে এবং পরে মরে গেলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি একত্রিত হয়ে কোরালের সৃষ্টি করে। কোরালসমূহ সমুদ্রের তলদেশে অবস্থিত বলে সাধারণ পর্যটক সেখানে পৌঁছতে পারে না তাই ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবি টেলিভিশনে দেখেই দুধের স্বাদ ঘোলে মিটায়। আজ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম কসমোনোভা অমনিম্যাক্স থিয়েটারে যেখানে ছবিকে ছবি বলে ভ্রম হয় কেননা বাস্তবতার সাথে অদ্ভুত মিল রয়েছে। আমাদের মনেই হয়নি যে, আমরা ছবি দেখছি। মনে হচ্ছিল যে, আমরাই পর্যটক হিসেবে ভ্রমণ করছি। সামুদ্রিক ঝড়ের তেজ ও তার রুদ্ররোষ এবং তার সংহারিণী মূর্তি দেখে আমরা হলের লোকেরাই মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠেছি। জাহাজের দোলা অনুভব করেছি। মনে হচ্ছিল পড়ে যাচ্ছি। ভারসাম্য রক্ষার জন্যে এবং পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে নিজের অজ্ঞাতেই কিছু একটা ধরতে চেষ্টা করেছি। পরে দেখেছি যে, নিজের চেয়ারের হাতল জোড় করে ধরে রয়েছি। পায়ে মাটি চেপে ধরার চেষ্টা সকলেই করছি। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি।

যেহেতু টিকেট কাটা সত্ত্বেও প্রথম ছবিটি আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পারেনি তাই সিনেমা কর্তৃপক্ষ আমাদের সকলকেই তৃতীয় ছবিটি দেখার অনুমতি প্রদান করল। আমরা 'বরফের দেশে' ছবিটিও দেখলাম। অনেকগুলো স্কুলের

www.pathagar.com

ছেলে-মেয়ে এসেছে ছবিটি দেখতে। স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে এ ধরনের ছবি তাদের দেখানো হয়ে থাকে। তাদের চিৎকার ও হৈ হুল্লোড় থেকে বুঝতে অসুবিধা হল না যে, তারাও ছবিটি খুবই উপভোগ করেছে। এই ছবিটির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল আরক্টিক ও অ্যান্টারক্টিক মহাদেশের প্রাণীকুল যথা-পেঙ্গুইন, সীল মাছ, সী লায়ন, নানা ধরনের পাখী যারা বরফের রাজত্বে বাস করে তাদের জীবন ধারার বর্ণনা।

কসমোনোভা দেখার পর ঘরে ফেরার পথে হাশেম সাহেবের সাথে আবারও আলাপ জুড়লাম। এবারে তিনি সুইডেনের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর আলোকপাত করলেন। মাত্র ১০০ বছর আগেও সুইডেন ছিল কৃষিনির্ভর দরিদ্র একটি দেশ এবং তাদের চাহিদা মিটাতে পারঙ্গম ছিল না বলেই উত্তর আমেরিকায় পাড়ি জমাত। ১৮৮০ খৃস্টাব্দেই শুধু কয়েক লক্ষ সুইডেনবাসী আমেরিকায় চলে যায়। কিন্তু যারা দেশে থেকে গেল তারা দেশকে গড়ে তোলার জন্যে শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটালো এবং এর ফলে অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার হলো। সেই থেকে শুরু করে বিগত ১০০ বছরে এই দেশের অর্থনীতি বলিষ্ঠ হয়েছে এবং বর্তমানে দেশ হয়েছে সমৃদ্ধশালী। তাই বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিবাসীগণ এখন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্যে সুইডেনে এসে ভীড় জমাচ্ছে। শুধু অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথাই বলব কেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্যেও বিদেশীরা সুইডেনে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। উদার মতবাদের ধারক হিসেবে সুইডেন প্রসিদ্ধ। তাই তসলীমা নাসরীনের মত দেশখেদা অবাঞ্ছিতা মহিলা এখানে নির্ভয়ে আশ্রয় পায়। নারী স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয়দাত্রী তসলিমা নাসরিন এখানে এসে বহাল তবিয়তে আছে এবং সুইডেন সরকারের সমস্ত প্রকার সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।

সুইডেনের উন্নতির কারণ কি? অর্থনীতিবিদগণ নির্দ্বিধায় বলেন যে, বিগত প্রায় ২০০ বছর ধরে তারা কোন যুদ্ধবিগ্রহে যায়নি বলে তাদের দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোতে কোন আঘাত আসেনি। তাই শক্ত ভিত্তির উপর তারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে তাদের অর্থনীতিকে। তাছাড়া নিবিষ্ট মনে কাজ করার ও অপচয় না করার স্বভাব আছে বলেই তাদের সম্পদ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অর্থনীতি হয়ে উঠছে সবল।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় বিগত বছর গুলোতে, সুইডেনের বেকারত্বের হার ছিল অনেকটা নিম্নে। কিন্তু সম্প্রতি বেকারত্বের হার ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বগামী হচ্ছে এবং বর্তমানে প্রায় ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সুইডেনবাসীরা কোন রাজনৈতিক জোট গঠনের পক্ষপাতী নয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্যে তারা এখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। সুইডেন সমস্ত রাজনৈতিক জোটের

www.pathagar.com

বাইরে থেকেও কিন্তু প্রথম থেকেই জাতিসংঘের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে অবদান রেখে আসছে। তাদের একনিষ্ঠ চেষ্টাতে এতটা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে যে, তারা বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম ধনী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। মাথাপিছু আয় প্রায় ২১০০০ মার্কিন ডলার যা ইউরোপে দ্বিতীয় এবং জাপান ও আমেরিকা থেকেও কিছুটা বেশী। জীবনযাত্রার মানও বেড়েছে অনেক। প্রত্যেকেই এখন ঠাণ্ডা, গরম পানি সরবরাহ সহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ী ভোগ করছে। প্রত্যেক বাড়ীতে টেলিফোন, ফ্রিজার, রিফ্রিজারেটর, মাইক্রোওয়েভ, রঙিন টেলিভিশন, ভিডিও, কম্পিউটার, সি ডি রম এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক যাবতীয় প্রয়োজনীয় ও বিলাসবহুল উপভোগ্য সামগ্রী রয়েছে।

হাশেম সাহেব বললেন এখানে জীবন ব্যবস্থাই এমন যে, মা কিংবা বাবার যে কোন একজনকে তাদের শিশুর দু'বছর বয়স পর্যন্ত অবশ্যই ঘরে থেকে দেখাশুনা করতে হবে। সুইডেনে মাতৃ ছুটি (Maternity leave) দু'বছর এবং বাবা কিংবা মা পুরো বেতন ও ভাতাতে এই ছুটি উপভোগ করতে পারে। তারপর দুধের বাচ্চাকে সকালে কাজে যাবার পূর্বে Day Care-এ মানে বাচ্চাদের নার্সিং হোমে রেখে পিতা-মাতা উভয়েই কাজে চলে যেতে পারে। কাজ থেকে ফেরার পথে যে কোন একজন বাচ্চাকে সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে পারে। শিশু ছেলেই হোক কি মেয়েই হোক ৭ বছর বয়স থেকে স্কুলে যাওয়া শুরু করতে হয় এবং পরবর্তী ৯ বছর বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। শিশুটির বয়স তখন ১৬ বছর হবে। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষার পর কিছুসংখ্যক ছাড়া আর সকলকেই সেকেন্ডারী স্কুলে আরো ২ বছর পড়াশুনা করতে হয়। বই, খাতাপত্র, কাগজ, কলম ইত্যাদি সবই স্কুল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করে। তা ছাড়া দুপুরে খাবার ব্যবস্থাও স্কুল থেকেই করা হয়।

উচ্চশিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। চাকরিরত অবস্থায় বয়স্করা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করতে পারে। বেকার অথবা ছাটাইকৃত লোকদের ঘরে বসে অলস জীবন কাটানোর জো নেই। সরকার উচ্চশিক্ষা অথবা ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দেয়।

আমাদের দেশে যেমন চাকর-বাকরের সাহায্যে সমাজপতি, সমাজের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাও শারীরিক পরিশ্রম ছাড়াই বেশ আরাম-আয়েশে ঘরকন্না করতে পারে, সুইডেনে সে উপায় নেই। নারী পুরুষ সকলেই জাতীয় কর্মকাণ্ডে কোন না কোন কাজে নিয়োজিত থাকতে হয় বলে গৃহভৃত্য শ্রেণীর লোক পাওয়া যায় না। তাই ঘরে স্বামী, স্ত্রী, ছেলে পুলে সকলকেই ঘরের কাজ করতে হয়। নারী-পুরুষ সকলকেই ঘর মোছা, কাপড় কাচা, ঘরদোর ঝাড়-পোঁছ করা, রান্না বান্না করা, বাসন কোসন মাজা, নিজের জুতো-জামা ঠিক করে রাখা ইত্যাদি

www.pathagar.com

নানাবিধ ঘরোয়া কাজ করতে হয়। তাছাড়া ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা, একদম শিশুদের ন্যাপী পাল্টানো, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই করতে হয়। আমাদের দেশে স্বামী এসব কাজ করবে এটা চিন্তাও করা যায় না। স্বামী যদি এসব করে তাহলে স্ত্রী করবেটা কি? কিন্তু সুইডেনের সমাজ ব্যবস্থাই এমন যে, স্ত্রীকেও স্বামীর মতই বাইরে কাজ করতে যেতে হয়, তাই ঘরের কাজ ভাগ করে করতে হয়। ঘরের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্যে শিক্ষার প্রয়োজন। তাই সুইডেনে স্কুলের পাঠ্যক্রমেই গৃহস্থালী কাজের কোর্স থাকে। গ্রুপ হিসেবে ক্লাসের সকল ছেলে-মেয়েকেই স্কুলেই পাক শেখানো হয় এবং ঘরের যাবতীয় কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং কোর্স শেষে প্র্যাকটিকাল পরীক্ষাও নেয়া হয়।

কথা বলতে বলতে আমাদের বাস স্টেনটায় আমাদের বাসস্থান সংলগ্ন বাস স্টপেজে পৌঁছে গেল। আমরা নেমে ঘরে ফিরলাম। শেলীর বদৌলতে আজকের দিনটা স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় শাসন ব্যবস্থার রূপায়ন

সুইডেনের রাজা চার্লস XII, ১৭১৮ খৃস্টাব্দে নিহত হবার পর, সুইডেনে বাল্টিক সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা না চেয়ে সুইডেন এগিয়ে চলে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে। গুষ্টভ III, (১৭৭১-১৭৯২) এর রাজত্বকালে, ফরাসী সম্রাট লুই XVI, এর সময়কার ফরাসী দেশের কৃষ্টির অনুকরণে সুইডেনে শিল্প, সাহিত্য, নৃত্য-গীত, ও চারুকলার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে রাজা ব্যক্তিগতভাবে গভীর মনোযোগ দেন। তিনিই স্থাপন করেন 'রয়েল অপেরা' এবং 'সুইডিশ একাডেমী'। এই একাডেমীর মাধ্যমেই সাহিত্যের জন্যে 'নোবেল প্রাইজ' প্রদান করা হয়ে থাকে। সুইডেনের দুর্ভাগ্য যে, গুষ্টভ III স্টকহল্‌ম অপেরা হাউসে আততায়ীর গুলিতে গুরুতর আহত হন।

যে দেশটি মধ্য যুগে ইউরোপের ত্রাস ছিল সেই সুইডেনই ১৮১৪ সালের পর থেকে অদ্যাবধি ইউরোপের যুদ্ধের মঞ্চে থেকেও যুদ্ধ থেকে একদম সরে দাঁড়িয়েছে। ১৮০৯ সালে রাশিয়ার সম্রাট জার আলেকজান্ডার I এবং নেপোলিয়নের-এর মধ্যে এক চুক্তি বলে বাল্টিক সাগরের পূর্ব উপকূলে ফিনল্যান্ড- যা ৬০০ বছর ধরে সুইডেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা জারকে দিয়ে দেয়া হয়। সুইডেন এটা মনে প্রাণে মেনে নিতে পারল না। তাই জার- নেপোলিয়ন চুক্তির পরপরই সুইডেনবাসীরা নেপোলিয়নের অধীনস্থ "জন ব্যাপটিসতে বারনাডেট"

www.pathagar.com

নামক এক ফিল্ড মার্শালকে সুইডেনের রাজা নির্বাচিত করে এবং 'কার্ল জোহান XIV' নামকরণ করে সুইডেনের সিংহাসনে বসায়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ফরাসীদের সাহায্যে ফিনল্যান্ড উদ্ধার করা। ফল ভালই হল। ১৮১৪ খৃস্টাব্দে নেপোলিয়নকে পরাজিত করল সুইডেনের বাহিনী। সেই যুদ্ধই ছিল সুইডেনের শেষ যুদ্ধ। ইউরোপের রণাঙ্গনের পাশে অবস্থান করেও সুইডেন প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সুইডেনের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি প্রায় ভেঙ্গে পড়ে এবং লক্ষ লক্ষ সুইডেনবাসী খাদ্য ও জীবিকার অন্বেষণে আমেরিকায় চলে যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও দেশত্যাগের হিড়িক চলতেই থাকে এবং ১৯৩০ সাল নাগাদ প্রায় ১০ লক্ষ সুইডেনের নাগরিক দেশত্যাগ করে বিদেশে চলে যায়।

সুইডেনবাসী যারা দেশে থেকে গেল তারা দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশের শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনীতিকে মজবুত করার দিকে নজর দিল। এই ব্যাপারে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটি পার্টি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করল। তারা ১৯২০ সালে ক্ষমতায় এসে দেশকে সমাজ কল্যাণ মূলক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে ব্যাপক সামাজিক সংস্কার সাধনের কাজ হাতে নিল। সমাজ কল্যাণের দিকে নজর দিলেও সমাজতন্ত্রের কুঠার দিয়ে বিত্তবানদের মাথা ভাঙ্গতে চেষ্টা করল না। তাই ছোট-বড় সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ব্যক্তি মালিকানায়ই রেখে দেয়া হয়েছিল এবং এখনও রয়েছে। সুইডেন সমাজ কল্যাণকে গ্রহণ করেছে কিন্তু সমাজতন্ত্রের তন্ত্র মন্ত্র বাদ দিয়েছে। তাদের দেশের ছোট-মাঝারি ও ভারী শিল্প ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকায় প্রবৃদ্ধির হার অনেক বেড়েছে এবং Incentive অর্থাৎ উৎসাহ প্রদান প্রথা থাকায় নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এতে একদিকে কর্মসংস্থান বেড়েছে অন্যদিকে সমাজ কল্যাণ রাষ্ট্রের ন্যায্য পরিকল্পিত সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ ট্যাক্সের মাধ্যমে যোগান দেয়া সম্ভব হয়েছে। হ্যাঁ... সুইডেনবাসীরা পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী ট্যাক্স দিয়ে থাকে কিন্তু এতে ওরা গর্ব অনুভব করে এ জন্যে যে, তাদের দেশই একমাত্র দেশ যেখানে মাতৃগর্ভে আগমন থেকে মৃত্যুর শেষ প্রহর পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণের জন্যে নিষ্ঠার সাথে রাষ্ট্রীয় কলকব্জা কাজ করে যাচ্ছে এবং সুইডেনের নাগরিকদের সকল চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে। তাই ট্যাক্স দিয়েই তারা আনন্দ পায়। এখানে আমাদের দেশের মানসিক দীনতার উল্লেখ না করে পারছি না। ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পর সমস্ত দেশবাসী নেতাদের দিকে চাতকের মত চেয়েছিল সঠিক নেতৃত্বের আশায়। শুধু চেয়েছিল যে, নেতাগণ নিঃস্বার্থভাবে নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে সকলকে নিয়ে সোনার বাংলা গড়ে তুলবে। উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করবে। কিন্তু আমাদের তৎকালীন নেতারা যথাযথ নেতৃত্ব দিতে অপারগ হলেন। প্রথমেই ভুল করে বসলেন। রাশিয়ার

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্র আমদানী করে জাতীয় কার্যকলাপে উৎসাহ ও উদ্দীপনার বীজ নষ্ট করে দিলেন। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন এত কমিয়ে দিলেন যে, সৎ পথে থেকে দু'মুঠো অন্ন সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে উঠল। বুভুক্ষু অবস্থায় থেকে থেকে দেশপ্রেম উবে গেল। মুক্তিযুদ্ধে জানবাজি রেখে যারা দেশ স্বাধীন করেছিল, যে স্বপ্ন তারা দেখত এবং যে আশার আলোর পেছনে তারা ছুটেছিল তা যেন তাদের নিকট অর্থহীন মনে হল। দেশপ্রেম তাদের নিকট একটা ধাঁধা বলে মনে হল। দেশপ্রেমের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করা তাদের নিকট নিরর্থক মনে হল। আত্মত্যাগের মহিমার অমোঘ বাণী এবং সংকটে ধৈর্য ধারণের কিচ্ছা-কাহিনী তাদের নিকট মন ভুলানো ললিপপ মনে হল। প্রশ্ন করল-আমরা কষ্ট করেছি, রক্ত দিয়েছি, স্বাধীনতা এনেছি কিন্তু এই স্বাধীনতা আমাদের কি দিয়েছে? 'ঝলসানো রুটি'? সমস্ত জাতি হতাশায় ডুবে গেল।

সমাজতন্ত্রের নামে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মাধ্যমে সকলকে নিরুৎসাহ করায় বিরাট অবদান রাখলেন তখনকার দিনের সরকার। হতাশাগ্রস্ত জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্যে বিজয়ীর উদার দৃষ্টিভঙ্গি না নিয়ে বিজিতের আত্মরক্ষামূলক মনোবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে চলল। জয় করার নীতি পরিহার করে, পরাজয় এড়ানোর নীতি গ্রহণ করে বসল। তাই আমাদের প্রাপ্য আমরা পেলাম। ভগ্নোৎসাহ জাতি ঢিমেতালে এগিয়ে চলল। ট্যাক্স প্রদানের মাধ্যমে যে জাতির সার্বিক মঙ্গল হয় তা থাকলো আমাদের অনুভূতির ঊর্ধ্বে, আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে এবং আমাদের শ্রুতির অগোচরে। তার স্থলে জন্ম নিল ট্যাক্স ফাঁকি দেবার কৃষ্টি।

মনে পড়ে ১৯৯৪ সালে তৎকালীন অর্থ মন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন যে, জাতীয় পর্যায়ে যে সংস্থা অথবা লিমিটেড কোম্পানি ১০ কোটি টাকার বেশী ট্যাক্স প্রদান করতে পারবে, সরকার সেই সংস্থা অথবা লিমিটেড কোম্পানি প্রধানদের V.I.P পদ-মর্যাদা প্রদান করবে। এই সম্মানটুকু তিনি দিতে চাচ্ছিলেন ট্যাক্স প্রদানকারীদের উৎসাহিত করার জন্যে।

সে বছর ঘটা করে প্ল্যানিং কমিশনের মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভি আই পি কার্ড দেয়া হয়। প্রাপক ছিল সংস্থা এবং লিমিটেড কোম্পানির মাত্র ৪ জন। তার মধ্যে ২ টি বিদেশী ব্যাংক এবং একটি বিদেশী ওষুধ কোম্পানি এবং দেশীয় কোম্পানি ছিল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যারা সুদবিহীন পদ্ধতিতে ব্যাংকিং ব্যাবসা পরিচালনা করে সরকারের খাজাঞ্চী খানায় ১০ কোটিরও বেশী টাকা আয়কর হিসেবে দিয়েছিল। ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে আমাকেই V.I.P কার্ডটি গ্রহণ করতে হয়েছিল। কার্ড প্রদানের সময় অর্থ মন্ত্রী সাইফুর রহমান আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত দৈত্যসম বৃহৎ ব্যাংকসমূহ এই সম্মান পাবার

www.pathagar.com

উপযোগী হতে পারল না কিন্তু এই ক্ষুদ্র ইসলামী ব্যাংক তাদের সীমিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে যে লাভ করতে সক্ষম হয়েছে তা থেকে তারা ১০ কোটি টাকার বেশী আয়কর দিতে পারছে। তিনি আরো মন্তব্য করেছিলেন যে, বড় বড় লিমিটেড কোম্পানিগুলোর হিসেব দেখা প্রয়োজন। প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন সত্য, কিন্তু প্রয়োজন পূরণের কলকাঠি বোধ হয় তাঁর হাতে ছিল না। ভবিষ্যতে বড় বড় কোম্পানির হিসেব দেখার সুযোগ সরকারের হয়েছিল কিনা তা জানি না তবে এটুকু জানি যে, পরবর্তী বছর গুলোতেও আমরা ১০ কোটির অনেক বেশী আয়কর দিয়েছি কিন্তু V.I.P. card পাবার সম্মান আর পাইনি। সরকার এ ধরনের সম্মান প্রদানের প্রথাই বিলুপ্ত করে দিয়েছিল। যারা ট্যাক্স ফাঁকি দেয় তারাই বোধ হয় এমন ভাবে চাবি ঘুরিয়েছিল যেন ভবিষ্যতে তারা আর বিব্রতকর পরিস্থিতিতে না পড়ে।

পুরস্কার বিতরণের পর চা পর্বে আমাদের দেশীয় বড় বড় কোম্পানির পরিচিত মালিক ও পরিচালকবৃন্দ রঙ্গ করে বলেছিলেন-"কমোডর সাহেব আপনাদের কোম্পানিতে কি অভিজ্ঞ হিসাব রক্ষক নেই?" কথার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত থেকে বুঝে নিয়েছিলাম Book keeping (হিসাব রক্ষণ) এর সময় আইন সম্মত উপায়ে বিভিন্ন খাতে ব্যয় বেশী দেখিয়েই আয় কম দেখানো যায়। আর এই ব্যয়টা সত্যিকার ব্যয় নয় এটা হচ্ছে ভোগ বাবদ ব্যয় অথবা কোন গোপন ভাণ্ডার সংরক্ষনের জন্যে দেখানো ব্যয়। কথাটার উল্লেখ এ জন্য করলাম যে, এ ধরনের হিসাব রক্ষণরীতি বর্তমানে আমাদের দেশে চালু হয়েছে এবং ঘুষ যেমন বর্তমানে কাজ আদায় করে নেয়ার জন্যে স্বীকৃত প্রথাতে পরিণত হয়েছে তেমনি আয়কর ফাঁকি দেয়াটাও জাতীয় কৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে।

১৯২০ সাল থেকে সত্যিকার অর্থে সুইডেনের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা শুরু। তখন সুইডেনের অবস্থাকে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সাথে তুলনা করা চলে। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, ১৯৭২ পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাস ব্যর্থতায় ভরা আর সুইডেনেরটা হচ্ছে পাল তোলা তরীর মত তর তর করে এগিয়ে যাবার ইতিহাস। সুইডেনের সাফল্যের ইতিহাস তুলে ধরার পিছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সুধী পাঠকের মনে উৎসাহব্যঞ্জক আকুতি সৃষ্টি করা যাতে তারাও সুইডেনের অনুকরণে দেশ গড়ার কাজ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে হাতে নেয়।

গত কয়েকশত বছর ধরে সুইডেনে রাজাই ছিল সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টি শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এনে রাজার ক্ষমতাকে শুধুমাত্র অভিভাবকের দায়িত্ব পালনে সীমাবদ্ধ করে দেয়। (অনেকটা আমাদের দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার মত)। রাজা

www.pathagar.com

এখন গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কাজ করে যান। কোন প্রকার নির্বাহী ক্ষমতা রাজার নেই। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা দেশকে এত সুন্দর ভাবে চালাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা এমনভাবে অব্যাহত রেখেছে যে, গত ৪৪ বছর ধরে জনগণের আস্থা তারাই পেয়ে এসেছে। মধ্যে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২, মাত্র ৬ বছরের জন্যে একটা কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় আসতে পেরেছিল। সুইডেনে সরকারের সমাজ কল্যাণ নীতিকে সমস্ত বিরোধী পার্টি পূর্ণ সমর্থন দেয় এবং প্রয়োজনবোধে সরকারকে সাহায্য করে থাকে। 'বিরোধিতার জন্যে বিরোধী দল' এই মতবাদে তারা বিশ্বাসী নয় তাই পূর্ণমেয়াদ পর্যন্ত নির্বাচিত সরকারের স্থায়িত্ব নিশ্চিত। এমন কি ১৯৮৬ সনে, তাদের প্রধান মন্ত্রী, ওলফ পামের গুপ্ত হত্যাও দেশের শাসন ব্যবস্থাকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। বিরোধীরা এ ধরনের হঠাৎ পেয়ে যাওয়া মওকা দেশের স্থায়িত্বের খাতিরে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেনি।

সুইডেন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে নিরপেক্ষ থাকলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইউরোপের সাথেই আছে। ১৯৯৪ সনে তারা গণভোটের মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সুইডেন আমাদের দেশের মতই গণতান্ত্রিক দেশ এবং প্রতি ৪ বছর পর পর নির্বাচন হয় এবং ১৮ বছরের উর্ধ্বে সকলেই ভোটাধিকার পায়। তবে ভোট ব্যক্তি নির্বাচনের জন্যে ব্যবহৃত হয় না, হয় পার্টি নির্বাচনের জন্যে। নির্বাচনশেষে প্রতিটি পার্টি তাদের ভোট প্রাপ্তির আনুপাতিক হারে ৩৪৯ টি সংসদ সদস্য আসন ভাগ করে নেয় এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন করে। এ ভাবেই তাদের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে যথার্থই তারা সুইডেনকে শান্তির দেশে পরিণত করেছে।

নিনাসাম যাবার পথে

গত কদিন ধরে শুধু শহরই দেখলাম। শহরের ভেতরে ভ্রমণ করে দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। তাই ভাবলাম একদিন কোথাও সারা দিনের জন্যে বাইরে গ্রামাঞ্চলে চলে যাব। কোথায় যাওয়া যায় তার ভার ছেড়ে দেয়া হল হাশেম সাহেবের দুই কন্যার উপর। একজন আমাদের উত্তরে মারস্টা কিংবা সিগটুনা পাঠাতে চায়, অন্যজন চায় আমরা দক্ষিণে নিনাসাম ও দালারোতে যাই। বাসা থেকে উভয় স্থানের দূরত্বই প্রায় ৬০/৭০ কিলোমিটার। সুইডেনে আমাদের গোনা গাঁথা দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে তাই ভাবলাম যে, কষ্ট হলেও দু' জায়গাতেই যাব-একই

www.pathagar.com

দিনে। ঠিক করলাম যে, হাশেম সাহেবের নেতৃত্বে ৮ ডিসেম্বর রবিবার আমরা প্রথমে দক্ষিণে নিনাসাম যাব এবং সেখান থেকে বাসে করে একদম বাল্টিক সাগরের ধার ধরে দালারোতে যাব।

যাত্রার দিনটাতে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের সামান্য নিচে ছিল এবং আকাশ সামান্য মুখভার করে থাকলেও অশ্রু বর্ষনমুখ ছিল না। সারা দিনের জন্যে যাচ্ছি তাই শেলী আমাদের জন্যে ডিমের স্যান্ডউইচ, রুটি, হালুয়া এবং টিনজাত কোমল পানীয় একটা ব্যাগে করে ভরে দিলেন। হাশেম সাহেবরা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ধার্মিক, তাই কোথাও বাইরে খান না। কি খেতে কি খেয়ে ফেলে এই ভাবনায় তটস্থ থাকে। আপাতঃদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হালাল মনে হলেও হয়ত পাক পবিত্র নাও হতে পারে তাই বাইরের সব খাবার পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। মাংস খাওয়া সম্পূর্ণ বারণ। সিদ্ধ মাছ মুখে ভোলা যায় তবে ওতে যদি কোন প্রকার তেলের পোঁচ থাকে তাহলে বারণ। কে যায় অত হিসেব করতে? তাই ঝামেলা এড়ানোর জন্যে ঘরের খাবার বহন করে নিয়ে যাওয়া বেহতের অর্থাৎ ভাল।

আমরা টি-সেন্ট্রালেন রেল স্টেশন থেকে ভূপৃষ্ঠগামী ট্রেনে করে নিনাসামে যাব। জমজমাট-বড় স্টেশন। এখান থেকে ইউরোপগামী ট্রেনসমূহ ও দূরপাল্লার গাড়ীসমূহ ছাড়ে। স্টেশনের ভেতরেই দোকান পাট, ব্যাংক, পর্যটন অফিস, ক্যাফেটারিয়া, বইয়ের দোকান অতি সুন্দর ভাবে সাজানো আছে। খোলামেলা ভাব মনটাকে প্রশান্তিতে ভরে দেয়। প্রত্যেকেই তার কাজ নিয়ে বেশ তৎপর, দ্রুত চলাফেরা করছে কিন্তু শব্দের আধিক্য নেই। চারদিকের মেঝেটা ধুয়ে মুছে এমন ঝকঝকে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে যেন মনে হয় মন্দির কিংবা মসজিদের মেঝে।

স্টেশনে এক সুইডিশ ভদ্রমহিলার সাথে আলাপ হল। তিনি সুইডেনের দক্ষিনাঞ্চলে থাকেন এবং অল্প অল্প ইংরেজি জানেন। বেশ আলাপী ভদ্রমহিলা। তাই তিনি তার অল্প ভাষাজ্ঞান নিয়েই আত্মবিশ্বাসের সাথে আমাদের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। বিদেশে ভাব, ভাষা, সম্প্রীতি ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা সব অবস্থাতেই পর্যটকদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। পরশ, চাহনি ও কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে আবেগ প্রস্ফুটনের কোন দিক বুঝতে অসুবিধা হয় না। তথ্য সংগ্রহ করা মুশকিল হয় তবে চেষ্টা করলে তাও মোটামুটি সংগ্রহ করা যায়। অগত্যা যদি কিছুই না বোঝা যায় কিংবা বোঝানো না যায় তবু ক্ষতি নেই। অক্ষমতা প্রকাশের হাসি অত্যন্ত নির্মল-বিশেষ করে সে হাসি যদি সহৃদয়তার হাসিতে সমুজ্জল হয়। ভাব বিনিময়ের জন্য যে সময় ব্যয় করা হয় তা কখনও অপচয় বলে মনে হয় না বরং স্মৃতির ভাণ্ডারে মনি হয়ে থাকে। এ উপলব্ধি যাদের আছে তারা বিনা দ্বিধায় তথ্য সংগ্রহে এগিয়ে যায় এবং আর কিছু না পেলেও অন্তরঙ্গতা খুঁজে পায়। আর এটাই পর্যটকদের মনোবৃত্তি হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

পর্যটকগণ কি শুধু গাছপালা, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে যায়? না ঐ অঞ্চলের লোকদের সাথে আলাপ করে তাদের পছন্দ-অপছন্দ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের অন্তরের সৌন্দর্য এবং তাদের দুঃখ-বেদনার কাহিনী শুনে একটা সামাজিক চিত্র মনে গেঁথে নিতে যায়? যদি মনের দোর উদ্ঘাটনের চেষ্টাই না করা হয় তাহলে ঐ দেশীয় লোকের মনের সৌন্দর্য, চোখের চাহনির ভেতর দিয়ে মনের আবেগ, উচ্ছাস ও অনুভূতি পর্যটকদের উপলব্ধির বাইরে থেকে যাবে। দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আমাদের সাথে ভদ্রমহিলার আলাপ জমল। তার ব্যবহার অত্যন্ত মিষ্টি ছিল। তিনি জানালেন যে, তার বাড়ীর পাশেই এক বাংলাদেশী মহিলা একজন সুইডেনবাসীকে বিয়ে করে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করছেন। তিনি বাংলাদেশী মহিলাটির খুব প্রশংসা করলেন। আমাদের কাছেও এই খবরটা ভাল লাগল। তিনি আরও জানালেন যে, বর্তমানে সুইডেনে প্রায় প্রত্যেকটি অনুন্নত দেশ থেকেই উদ্বাস্তু এসেছে। এদের মধ্যে তুরস্কের লোকেরা খুবই উচ্ছৃঙ্খল এবং কঠোর প্রকৃতির। পাকিস্তানীদেরও তিনি ভাল বললেন না। তারা সংখ্যায় এসেছে অনেক কিন্তু তারা স্বভাবে কাঠখোট্টা। আফ্রিকা থেকেও বেশ কিছু লোক এসেছে। ইরিত্রিয়া থেকে যারা এসেছে তারা ভদ্র ও অমায়িক বলে তিনি জানালেন। বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছে তাদের সংখ্যা কম তবে তারা ভদ্র এবং স্থানীয় লোকদের সাথে সহজেই মিশে যেতে পারে। তিনি মনে করেন যে, বর্তমানে সুইডেনে প্রতি ২০ জনের মধ্যে ১ জন বহিরাগত। সুইডেন এতটা ভার নিতে পারবে বলে তিনি মনে করেন না। তাই বর্তমানে বহিরাগতদের এদেশে আসার ব্যাপারে যে কড়াকড়ি সরকার আরোপ করছেন তা তিনি সমর্থন করেন।

আমাদের গাড়ীর সময় হয়ে এলো তাই আমরা উঠলাম। রেল ভ্রমণটা খুবই উপভোগ্য ছিল। ঝকঝকে, তকতকে পরিষ্কার ব্রডগেজ ট্রেন। (আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চলীয় ট্রেনসমূহ মিটার গেজ অর্থাৎ ৩৯ ইঞ্চি প্রশস্ত লাইনের উপর দিয়ে চলে এবং সুইডেনের ট্রেন ৬০ ইঞ্চি চওড়া লাইনের উপর দিয়ে চলে)। যে অঞ্চল দিয়ে পরিভ্রমণ করছি তা হচ্ছে তরঙ্গিত প্রান্তর। আমাদের গাড়ীর একদিকে অত্যন্ত সুন্দর সবুজ পাহাড়, পরিকল্পিত বনভূমিতে ভরপুর আর অন্যদিকে ঢাল নেমে গেছে গমের ক্ষেত বেয়ে বেয়ে অনেকটা দূরে দিগন্তে। কখনও পাহাড় আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাঁ দিকে আবার কখনও ডানদিকে। আমাদের গাড়ী অবলীলাক্রমে প্রান্তরের পর প্রান্তর পেরিয়ে তেপান্তরের দিকে ছুটছে। উন্মুক্ত প্রান্তরে পশুচারণ ভূমিতে দেখলাম অনেক ঘোড়া জ্যাকেট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিমাঙ্কের নিচে শীত হলে চড়ে ঘাস খাওয়া ঘোড়াদের পক্ষেও কষ্টকর। তাই তাদের গরম রাখার জন্যে কম্বলের জ্যাকেট পরিয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

পথের ধারে গমের ক্ষেতে দেখলাম সাদা কাপড় দিয়ে মোড়ানো বিশাল বিশাল আঁটি। হাশেম সাহেব জানালেন যে, এগুলো গমের আঁটি। গম কাটা হয়ে গেছে। ডগাসহ গমের শীষগুলো এক ধরনের কাপড় দিয়ে সুন্দর করে বেঁধে ট্রাকে করে ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যাওয়া হয়। মাঠে দেখলাম ঐ ধরনের অনেক বান্ডেল জমা হয়ে আছে ট্রাক পরিবহনের অপেক্ষায়। গম কাটা, আঁটি বাঁধা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ হয় মেশিনে। এত বাঁধা-ছাদার দরকার কি? এর জবাবে হাশেম সাহেব বললেন যে, প্রথমত এতে অপচয় কম হয় আর দ্বিতীয়ত ভিজে গিয়ে কিংবা সেঁত সেঁতে হয়ে গমের মান নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম হয়।

যাত্রাপথে দেখতে পাচ্ছি আমাদের একপাশে পরিকল্পিত বনভূমি আর অন্য পাশে সবুজ উন্মুক্ত হেলানো দোলানো মাঠ। মাঠের বুক চিরে অরণ্যের কোল ঘেঁষে সুন্দর সর্পিল পথ এগিয়ে গেছে ছবির মত নিখুঁত নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকা ছোট ছোট গ্রামের পা ছুঁয়ে। কোথাও বা পাহাড়ের ঢাল যেখানে অনেকখানি নিচে নেমে গেছে সেখানে নীল হ্রদ পটে আঁকা ছবির মত বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। প্রকৃতি উদার হস্তে এদের দান করেছে কিন্তু তাই বলে এরা বসে নেই। প্রত্যেকটি গ্রামকে তারা করে তুলেছে সত্যিকার অর্থে শান্তির নীড়। গ্রামে বাসিন্দা হয়ত বা ২০০ ঘর। সব মিলিয়ে ৬০০/৭০০ লোক হবে। হাশেম সাহেব জানালেন যে, প্রত্যেকটি গ্রামেই সুন্দরভাবে জীবন যাপনের সমস্ত ব্যবস্থা আছে। একটা কি দুটো সুন্দর ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, কিছু দোকানপাট, লাইব্রেরী, স্কুল, ছোট হাসপাতাল, খেলাধূলার মাঠ, রেস্তোরাঁ, ক্যাফেটারিয়া, ক্লাব ও বার ইত্যাদি প্রতিটি গ্রামেই থাকবে। শাসন ব্যবস্থা কার্যকর রাখার জন্যে প্রত্যেক গ্রামেই কিছু পুলিশ এবং ছোট সরকারী অফিস থাকবে। এই নিয়ে তারা পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটায়। দ্রুতগামী ট্রেন ছোট ছোট গ্রামে থামে না। তবে লোকাল ট্রেন এদের জংশন স্টেশনে নিয়ে যায় এবং অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করে।

গ্রামগুলো শুধু সাজানোই নয় এগুলোকে অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও রাখা হয়। গ্রামের পাশেই দেখলাম ছোট ছোট প্লটে সব্জীর বাগান। হাশেম সাহেব জানালেন যে, জমিটা পৌরসভার এবং তারা প্লট করে শাক সব্জী লাগানোর জন্যে মওসুমভিত্তিক গ্রামবাসীর নিকট ইজারা দেয়। মনে পড়ে ইংল্যান্ডের ডরসেটে আমার অনুজ ডক্টর আনিসুর রহমানের বাড়ীতে যখন গিয়েছিলাম তখন তার বাড়ীর পাশে মিউনিসিপ্যালিটির প্লটে তাকেও বাগান করতে দেখেছিলাম।

ট্রেন এগিয়ে চলল। নিনাসামে পৌঁছার একটু আগে প্রথম বারের মত টিকেট চেকারের সাক্ষাৎ পেলাম। দেখলাম, প্রত্যেকেই টিকেট কেটেছে। এখানে সবাই আইনকে শ্রদ্ধা করে। আইন রক্ষা করাকে নিজের দায়িত্ব মনে করে। আমাদের দেশের মত আইন রক্ষার দায়িত্ব শুধু পুলিশের উপর ছেড়ে দেয় না।

www.pathagar.com

নিনাসামে পৌঁছতে প্রায় দু'ঘন্টা লাগলো। নিনাসাম হচ্ছে সুইডেনের দক্ষিণাঞ্চলের একটি সমুদ্র বন্দর। এখান থেকে ডেনমার্ক ও ইংল্যান্ডের দিকে গাড়ীর ফেরী যায়। ছোট-বড় সমুদ্রগামী জাহাজও এই বন্দর থেকে পর্যটকদের নিয়ে সুইডেনের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ২৩০০০ দ্বীপমালার বিভিন্ন অঞ্চলে সফরে বেরোয়। বন্দরে নোঙ্গর করা এবং জেটিতে বাঁধা জাহাজ ছাড়া দেখবার মত কিছুই নেই। জমে যাওয়া শীতে আর ওদিকে গেলাম না। বেলা প্রায় ১২ টা। জোহরের নামাজ ও দুপুরের খাবার সেরে নেয়া দরকার। কাছাকাছি কোন ঘর বাড়ী নেই। স্টেশন সংলগ্ন শুধু আছে একটা 'বার' যেখানে স্ন্যাকস অর্থাৎ টুকিটাকি খাবার যথা- স্যান্ডউইচ, রুটি, মাখন, চা, কফি, টফি বিস্কুট ও কোমল পানীয় এবং মদ পাওয়া যায়। বাইরে হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা-একদণ্ড তিষ্ঠানো যায় না তাই বাধ্য হয়েই আমরা বারে ঢুকলাম। গ্রাহকরা চা-বিস্কুট খাচ্ছে কিংবা মদ খাচ্ছে। আমরা এককোণে একটা বেঞ্চিতে বসে বসে এক এক করে নামাজ পড়ে নিলাম এবং তারপর শুধু চা খেলাম। বারে উপবিষ্ট ভদ্রলোকগণ আমাদের অদ্ভুত ধরনের ব্যায়াম ঔৎসুক্যের সাথে দেখল এবং যখন শুনলো যে, আমরা প্রার্থনা করছি তখন আমাদের প্রতি তাদের ভক্তি বেড়ে গেল।

এরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর। আমি তখন ইংল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে লোয়েস্টফ্টে পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ব্রুকম্যারিন নামক এক শিপইয়ার্ডে পাকিস্তান নেভীর জন্যে দ্রুতগামী পেট্রোল বোট নির্মাণের তদারকিতে নিয়োজিত ছিলাম। ব্রুকম্যারিনের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার আর এ স্ট্রেটন, খৃস্টমাস ভোজে আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছেন। সে বছর ডিসেম্বর মাসে রমজান পড়েছিল। আমি ঠিক সময়মত পৌঁছলাম এবং স্ট্রেটন সাহেব সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাকে এক সুসজ্জিত কামরায় নিয়ে বসালেন। সেখানে আরও কিছু নির্বাচিত গণ্য মান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। শেরী পরিবেশন করতে এলো একজন। শেরী হচ্ছে এক ধরনের মদ যা ক্ষিধে বাড়ায় বলে ভোজের পূর্বে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। আমি শেরীর গ্লাস নিলাম না। আর একটু পর অপর এক জন নিয়ে এলো অন্য ধরনের পানীয় ও সিগারেট। আমি তাও ছুঁলাম না। এই সময় স্ট্রেটন সাহেব এলেন এবং আমি কিছুই খাচ্ছি না ও পান করছি না লক্ষ্য করে তিনি বলে উঠলেন, ওহহো ভুলেই গিয়েছিলাম যে, তুমি ফাস্টিং অর্থাৎ রোজা রেখেছ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঐ ঘরে খাপিনা সরবরাহ করতে বারণ করে দিলেন। তিনি স্বয়ং, আরও কিছু অতিথি এবং পরিবারের মুরুব্বি কয়েকজন শুধু আমাকে আপ্যায়নের জন্যেই তাদের ক্রীস্টমাস ভোজ আমার সাথে খেলেন আমার ইপ্তারের পর। সে সময় ইপ্তার ছিল বেলা সাড়ে তিনটায়। তাই তাদেরকে ঘন্টাখানেকের

www.pathagar.com

বেশী বসতে হয়নি। এই কাহিনীর অবতারণা করলাম শুধু এই শাশ্বত সত্যটি তুলে ধরতে যে, ধর্মের প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধাভাব আগেও ছিল এবং এখনও আছে।

'রারে' নামাজ পড়ে আমরা ফেরত যাত্রা শুরু করলাম। 'ভাস্টার হানিনজে' বলে একটা জংশন স্টেশন থেকে আমাদের 'দেলারো'-এর বাস ধরতে হবে।

১৩।

নিনাসাম ও সিগটুনা

নিনাসাম থেকে ভাস্টার হানিনজে জংশনে এসে শুনলাম যে, দিলারোর বাস মিনিট দশেক আগে চলে গেছে। পরবর্তী বাস যাবে বেলা ২ টায়। ঐ বাসে যদি আমরা যাই তাহলে দিলারো থেকে ফিরে আসতে ৪ টা বেজে যাবে এবং সিগটুনা যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই আমরা বৃহত্তর স্বার্থে দিলারো যাত্রা ভ্রমণ সূচী থেকে বাদ দিলাম এবং সিগটুনা যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। দুপুরের খাবার এখনও থলেতেই রয়ে গেছে। আমরা রেল স্টেশনে বসেই খাবার পর্বটি সেরে নিয়ে মিনিট ১৫ পর পরবর্তী ট্রেন ধরার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং সে অনুযায়ী বেলা আড়াইটায় আমরা সিগটুনার পথে রওয়ানা হলাম। স্টকহলমের কেন্দ্রীয় স্টেশন টি-সেনট্রালেন হয়েই আমাদের যেতে হবে অর্থাৎ টি সেনট্রালেন থেকে প্রথমে মারস্টা যেতে হবে ট্রেনে করে এবং তারপর মারস্টা থেকে মাইল সাতেক পথ বাসে করে যেয়ে আমাদের সিগটুনা পৌঁছতে হবে।

আমরা যখন স্টকহলম অতিক্রম করে সবুজ প্রান্তরের উপর দিয়ে মারস্টার পথে এগুচ্ছিলাম তখন সূর্য পশ্চিম আকাশে অনেকটা হেলে গেছে। পড়ন্ত বেলায় ট্রেন-ভ্রমণটা বেশ ভালই লাগছিল। আমরা যখন মারস্টায় পৌঁছলাম তখন দিনের আলো নিবু নিবু। সুইডেনে গোধূলি অনেকক্ষণ থাকে তাই রাস্তার সৌন্দর্য দেখতে দেখতেই আমরা সিগটুনাতে পৌঁছলাম।

ভাইকিংদের স্মৃতি বিজরিত শহর সিগটুনা মালারেন হ্রদের তীরে অবস্থিত। ভাইকিংদের আমলে স্থাপিত সুইডেনের প্রথম রাজধানী এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী বন্দর ছিল সিগটুনা। এখানেই প্রথম মুদ্রা প্রবর্তন করা হয়। ১০ম শতাব্দীতে সুইডেনের প্রথম খৃস্ট ধর্মাবলম্বী রাজা ওলফ স্কটকোল্যাং ধর্ম প্রচার কেন্দ্রিক শহর হিসেবেই এই শহরটি স্থাপন করেন এবং এখানে অনেক গীর্জা নির্মাণ করেন। পরে অবশ্য সিগটুনার ধর্ম প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আপসালা দখল করে নেয়। ধর্ম প্রচার কেন্দ্রের ও রাজধানীর মর্যাদা বর্তমানে না থাকলেও সিগটুনা এখনও নিজের আভিজাত্য নিয়ে সগৌরবে বিরাজমান।

www.pathagar.com

সুইডেনের খৃস্ট ধর্ম ও গীর্জাসমূহ সংস্কারের নামে সুইডেনের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রাজা গুষ্টভ ভাসা সিগটুনার অনেক গীর্জা বন্ধ করে দেন। ঐ সমস্ত গীর্জার ধ্বংসাবশেষ এখনও সিগটুনাতে দেখা যায়। সিগটুনাতে অনেক 'রুনে পাথর' বিদ্যমান। বৃহৎ পাথরের স্তম্ভ কিংবা খণ্ড যাতে প্রাচীনকালে সাংকেতিক হরফে ইতিবৃত্ত খোদাই করে লেখা হতো সেগুলো 'রুনে পাথর' বলে পরিচিত। সিগটুনাবাসীরা গর্ব করে বলে, বিশ্বের অন্য কোন শহরে সিগটুনা থেকে বেশী রুনে পাথর নেই। রুনে পাথরের চিত্রলেখনী এখনও দুর্ভেদ্য, তবে এর যে একটা ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে এটা সকলেই স্বীকার করে। তাই রুনে পাথরগুলো যেখানেই সম্ভব যাদুঘরের ভেতরে নেয়া হয়েছে এবং অত্যন্ত বৃহদাকার স্তম্ভগুলো বাইরে খোলা আকাশের নিচে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

বাসে করে যাবার পথে এক সিগটুনাবাসী কলেজে অধ্যয়নরত তরুণ উৎসাহভরে আমাকে সিগটুনার কীর্তি কাহিনী শোনাচ্ছিল এবং আমিও মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। এমন আবেগ নিয়ে সে সিগটুনার ইতিহাস বর্ণনা করছিল যে, মনে হচ্ছিল সে নিজেই বুঝি সেই পুরোনো দিনের ভাইকিং যে সিগটুনাকে সুইডেনের প্রথম রাজধানীর মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছিল। সে বলল যে, সিগটুনা দেখতে হলে আসবেন গ্রীষ্মকালে যখন এ সব উন্মুক্ত প্রান্তর সবুজ হয়ে ওঠে। দেখবেন সিগটুনার আকর্ষণে দূর-দূরান্ত থেকে আসছে পর্যটকগণ-বাসে করে, সাইকেলে চেপে, গাড়ীতে করে, পায়ে হেঁটে। সিগটুনা তখন যেন সেজে গুঁজে কনে হয়ে বসে থাকে এবং সকলেই কনে দেখতে এসে ভীড় জমায়। দেখবেন-দূরের পাহাড়ে ফুলের বাহার, অয়েল পেইন্টিং বলে ভ্রম হবে। মেলারেনের ঘন নীল জলে দেখবেন নানা রঙের ছোট ছোট নৌকো (ইয়াট) পেখম তুলে অর্থাৎ পাল তুলে এলোপাথাড়ি এদিক সেদিক মনের আনন্দে ছুটে চলেছে। সন্ধ্যা রাতে নীল আকাশের বুক ভরা উজ্জ্বল তারার আলো হ্রদের ঘন নীল জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে এক স্বপ্নের ভুবন তৈরি করে। দেখে মন চায় আমিও মিশে যাই এই মেলায়।

মেলার কথাই যখন এলো তখন সে উৎসাহভরে খবর দিল যে, আজ এই সন্ধ্যায়ই সিগটুনাতে মেলা বসবে। হয়ত এতক্ষণে বসেই গেছে। কিসের মেলা? সে জানাল যে, এটা হচ্ছে গৃহজাত সামগ্রী প্রদর্শনের মেলা। খুব মজা হয়। বর্ণনা দিতে তার উৎসাহের ভাটা নেই। এই মেলাতে নাকি গ্রামের শিশু, তরুণ-তরুণী, যুবক থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও আসে শুধু আজকের সন্ধ্যা উপভোগ করার জন্যে নয় বরং ভবিষ্যতের সওদা করতে। এই মেলাতেই স্থির হয়ে যায় আগামী গ্রীষ্মে টাউন হলে কারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। বেশ রোমাঞ্চকর একটা ভাব আছে। আমরাও গভীর আগ্রহে মেলা উপভোগ করার অপেক্ষায় থাকলাম।

www.pathagar.com

পথের ধারে শান্ত সমাহিত সাঁঝের আলোতে ক্লান্তভাবে শায়িত। গাড়ী সিগটুনার দিকে মোড় নিতেই হঠাৎ করে চোখের সামনে ভেসে উঠল চমৎকার দৃশ্য। ডানদিকে মেলারেন হ্রদের একটি বাহু প্রসারিত করে দূরের আলো ঝলমলে পাহাড়কে কাছে টেনে আনতে চেষ্টা করছে। ভাবখানা এই যে, 'যেতে নাহি দেব'। আর বাঁ দিকে হ্রদের অন্য একটি মোলায়েম বাহু ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড়কে স্নেহভরে আগলে রেখেছে। মনে হচ্ছে প্রশান্ত প্রকৃতি সকলকে নিয়ে সহ-অবস্থানে নিশ্চিন্ত।

মনে হচ্ছিল আমরা হ্রদের উপর দিয়ে চলছি। বাস্তবেও তাই। হ্রদের সংকীর্ণতম অংশের উপর দিয়ে সেতু পার হয়েই আমরা সিগটুনাতে পৌঁছলাম। সিগটুনা ফিনফিনে কুয়াশার চাদরে ঢাকা। আমাদের সাথের তরুণটি দৌড়ে চলে গেল মেলাতে। আমরাও ধীর লয়ে আলোর দিকেই চললাম।

খৃস্টমাস, যীশুখৃষ্টের জন্মদিন। ছোটবেলায় আমরা বড়দিন বলতাম কারণ সে দিনটি ছিল খৃস্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্যে অর্থাৎ আমাদের শাসনকর্তা ইংরেজদের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাই বড় দিন। সিগটুনাতে ডিসেম্বরের প্রতি রোববার মেলা বসে সন্ধ্যায়। রাস্তার ধারে প্রদীপ জ্বালিয়ে আমাদের দেশের মত ট্রলীর দোকান সাজিয়ে নানা প্রকার জিনিষপত্র নিয়ে বাহারী পোষাক পরে কুমারী ও যুবতীরা রঙ বেরঙ-এর জিনিষ বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। ট্রলীটিও রঙিন কাপড়, ফিতা ও কাগজ দিয়ে সযত্নে সাজানো হয়েছে আর ট্রলীর উপর আছে গৃহজাত দ্রব্যাদি যথা- ঘরে তৈরি করা পুতুল, কাগজের ফুল, মাটির তৈরি পুতুল, খেলনা, টুকিটাকি নানা জিনিষ। আরেক জায়গায় দেখলাম ঘরে তৈরি আচার, জ্যাম, জেলী, পিঠে, রুটি আরো কত কি খাদ্যদ্রব্য। শুটকি মাছ, ধূমায়িত শ্যামন মাছ এবং অন্যান্য মাছের প্রস্তুতকৃত খাদ্য দেখলাম। আর একটু দূরে দেখলাম কুশি কাঁটা দিয়ে হাতে বোনা মোজা, মাফলার টুপি, এবং নানা ধরনের ঝালরের দোকান। প্রত্যেক দোকানের সামনেই তরুণীরা ভীড় করছে এবং কেনা-কাটার ছলে তাদেরও দাদী ও নানীর স্তরের মহিলারা একটু যাচাই করে দেখছে তাঁদের ঘরে শোভা পাবে কিনা। অষ্টাদশ শতকে নির্মিত বিখ্যাত সিগটুনা টাউন হলে গ্রীষ্মকালে ঘটা করে বিয়ে হয়। প্রাচীন পন্থীরা ভাবী বধূকে এই মেলাতেই নির্বাচন করে এবং গুরুজনদের আশীর্বাদ পর্ব এই মেলাতেই হয়ে থাকে। এরপরই টাউন হল বুকিং এবং নির্দিষ্ট দিনে ঘরে তোলার পালা। এই মেলাটি লম্বায় ১০০ গজের মত হবে এবং বেশ আনন্দ মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। কেনা-বেচার আনন্দ এবং অদূর ভবিষ্যতে বধূ ঘরে তোলার আনন্দ।

www.pathagar.com

সিগটুনা মেলায় লেখক ও তার পত্নী

মেলারেন হ্রদের ধার ধরে ২০,০০০ লোকের এই শহরটি দৈর্ঘ্যে মাইল খানেকের বেশী হবে না এবং প্রস্তে এক চিলতে। সুন্দর শহর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সুপরিকল্পিত। এই শহরটি পায়ে হেঁটে দেখানোর জন্যে পথ প্রদর্শক রয়েছে এবং জনপ্রতি মাত্র ৩০ ক্রোনারে (২০০ টাকার মত) দু'ঘন্টা ব্যাপী সফর করায় এবং সব দ্রষ্টব্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেয়। শীতকালে পর্যটক কম হয় বলে এই সুবিধা থাকে না।

মেলার অদূরেই ড্রাকেগার্ডেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এটা ছিল আমির-ওমরাহদের বাড়ী। এখন পর্যটকদের তথ্যকেন্দ্র এবং মিউনিসিপ্যালিটির অভ্যর্থনা কেন্দ্র। ওখানে যেয়ে খুবই ভীড় দেখলাম। তাই কালক্ষেপণ না করে কিছু প্রচারলিপি সংগ্রহ করে বেরিয়ে এলাম। ড্রাকেগার্ডেনের সাথেই হচ্ছে টাউন হল সুইডেনের ভাষায় 'রাডহুসেট'। এই রাডহুসেটেই বিয়ে করার জন্যে লোক পাগল। এ সব বিয়ে হবে গ্রীষ্মকালে। টাউন হল থেকে রাস্তা পেরিয়ে উত্তরে গেলে মেলারেন উপত্যকার সর্বপ্রাচীন ইটের নির্মিত দালান যা ১২৪৭ সন থেকে গীর্জা ও গীর্জার পাদ্রীদের থাকার জন্যে ব্যবহৃত হত। এই দালানটি মেরিয়াকিরকান নামে পরিচিত। সিগটুনার অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে ভাইকিংদের সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়াম। ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে এই যাদুঘরটি। শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে ৪০০ গজের মধ্যেই গ্রানাইট পাথরে বানানো গীর্জা সেন্ট ওলোফ, সেন্ট পার এবং সেন্ট লারস্ সমূহের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সিগটুনা শহর দেখতে বড়জোর ঘন্টাখানেকের ব্যাপার তবে শহরের বাইরে আপসালা প্রদেশের সিগটুনা অঞ্চলে অনেক প্রাচীন স্মৃতিসৌধ রয়েছে। মারস্টা থেকে দক্ষিণে এবং সিগটুনা থেকে দক্ষিণ পূর্বে মাত্র ৫/৭ মাইল দূরে আগুজবিতে নর্ডিয়ান মোন্ড অর্থাৎ রাজাদের গোরস্তান একটা পাহাড়ের উপর সংরক্ষিত আছে। এই গোরস্তানে ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকেই রাজাদের সমাধিস্থ করা হত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত প্রাসাদ স্কেনলাহল্‌ম ও রোজারস্‌বার্গ নর্ডিয়ান মোন্ডের মাইল খানেকের মধ্যেই অবস্থিত। রোজারস্‌বার্গ প্রাসাদটি তৈরি করা হয়েছিল রাজা কার্ল জোহান XIV-এর জন্যে যাকে সুইডেনবাসীরা নির্বাচিত করে সিংহাসনে বসিয়েছিল ফিনল্যান্ড জয়ের জন্যে। এই প্রাসাদটি ইউরোপের সবচেয়ে সুন্দরভাবে রক্ষিত প্রাসাদ বলে খ্যাতিলাভ করেছে।

অল্প সময়ে সিগটুনা দেখে পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে কিছু যে দেখতে পেরেছি, কিছু যে ধারণা পেয়েছি সেটাও কম নয়। বাসে বসে তরুণ ছেলেটি যে ভাবে তার শহরের গর্ব করছিল তাতে আমার বারে বারেই মনে হয়েছিল প্রকৃত দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে কোন ছেলে কি আমাদের দেশের কোন শহরের প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতার গল্প করতে পারবে? মোটেই পারবে না। তার কারণ এই নয় যে, তারা দেশকে ভালবাসে না। কারণ হচ্ছে আমরা আমাদের পুরোকীর্তিকে সংরক্ষণ করছি না। তাই তারা কোত্থেকে ইতিহাস খুঁজে পাবে? কিভাবেই বা বিদেশীদের নিকট বলে তারা তৃপ্তি পাবে-গর্বে তাদের বুক ভরে তুলবে?

প্রশ্ন জাগে মনে আমাদের পর্যটন বিভাগ কি দেশকে এভাবে প্রস্ফুটনের ব্যবস্থা করেছে কিংবা করছে? আমাদের স্থানীয় কাউন্সিল কিংবা পৌরসভা কি তাদের ছোট বড় শহরকে পর্যটকদের জন্যে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কোন উদ্যোগ নেয়? শুধু বিদেশী পর্যটক কেন? দেশের অধিবাসীরাও আনন্দ-স্ফূর্তি করতে চায়, চায় বিনোদনের জন্যে কিছু ব্যবস্থা থাকুক যা সময় ও অর্থ ব্যয় করে তারা উপভোগ করতে পারে। এদিকে অবশ্যই আমাদের নজর দিতে হবে। আজ সিগটুনা থেকে ফেরার সময় এসব চিন্তাই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

।। ১৪ ।।

একো পার্কে প্রজাপতির ঘরে

স্টকহল্‌ম শহরের মধ্যেই কেন্দ্রবিন্দু থেকে মাইল দশেক উত্তরে সুইডেনের রাজকীয় একো পার্ক অবস্থিত। অষ্টাদশ শতকে রাজা গুষ্টোভ III এই পার্কটিকে

www.pathagar.com

ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদ সংলগ্ন পার্কের অনুকরণে তৈরি করেন। শহরের মধ্যে এই বিরাট জাতীয় পার্কটি উত্তরে উরলিকস্ডালের হাগা পার্ক থেকে শুরু করে দক্ষিণে ঝুরগার্ডেন ও ফেডারহল্মমারনা দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে নানা জাতীয় উদ্ভিদ, ফুল-ফল এবং বিনোদন সুবিধার সৃষ্টি করে এই পার্কটিকে পৃথিবীর অন্যতম আকষণীয় পার্ক হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

গুষ্টোভ III এর আমলে 'হাগা পার্ক' শহরের মধ্যে এক সুন্দর বিনোদনের জায়গা ছিল। তিনি এখানে একটা রাজপ্রাসাদও তৈরি করতে চেয়েছিলেন। ১৭৮৬ খৃস্টাব্দে, তিনি প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপন করেন কিন্তু নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই ১৭৯২ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে সমস্ত অসমাপ্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৮০২ খৃস্টাব্দে রাজা গুষ্টভ IV এডল্ফ পুনরায় প্রাসাদটি নির্মাণের কাজে হাত দেন এবং ১৮০৪ খৃস্টাব্দে নির্মাণ কাজ শেষ করেন। ১৯৬৬ সানের পর থেকে এই প্রাসাদটি সুইডেনে বিদেশী রাষ্ট্রীয় সফরকারী মেহমানদের বাসস্থানের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

গুষ্টোভ III এই পার্কটির একটা অংশে তার বাসস্থান, নির্মাণের পরিকল্পনাও করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত গার্ডদের জন্যে একটা তামার তাঁবু তৈরি করিয়েছিলেন। বর্তমানে এটার একটা অংশে পার্ক মিউজিয়াম করা হয়েছে এবং অন্য অংশে রেস্তোরাঁ ও কফি হাউস করা হয়েছে। তা ছাড়া গ্রীষ্মকালে প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় এখানকার প্রেক্ষাগৃহে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে থাকে। ইকো পার্কে রাজা থাকবেন তাই এটাকে রাজকীয় ভাবধারা ও স্টাইলেই সাজানো হয়েছিল। গুষ্টোভ III প্যাভেলিয়ন, ইকো প্রার্থনাগার এবং যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন রাজাদের নির্মিত নানাবিধ স্মৃতিসৌধ এই পার্কের মান বৃদ্ধি করেছে।

সুইডেনের স্টকহল্মে এসে এই পার্কটি না দেখে কিছুতেই যাওয়া যায় না, তাই শুক্রবার ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে এই পার্ক দেখতে গেলাম। হাগা পার্কের একধারে ২০০০ বর্গমিটার স্থান নিয়ে চারদিকে কাঁচ ও জালি দিয়ে ঘেরাও করে প্রজাপতি ও পাখীর ঘর তৈরি করা হয়েছে। এই ঘরটি-দুটো ভাগে বিভক্ত। একটা ভাগে রয়েছে হরেক রকম প্রজাপতি এবং যাতে তারা প্রাকৃতিক বাসোপযোগী পরিবেশ পায় তার জন্যে সুব্যবস্থা। বিভিন্ন ধরনের গাছপালা, গুল্মলতা, ও ফুলের কেয়ারীতে রাশি রাশি রঙিন ফুলের ঢের তৈরি করা হয়েছে। উষ্ণতা ও আর্দ্রতা রক্ষা করার জন্যে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রজাপতিদের মনের মত পরিবেশ ও তাদের জন্যে স্বর্গ তৈরি করে দেয়া হয়েছে। তাই তারা মনের আনন্দে চারদিকে উড়ে বেড়ায় এবং দর্শনার্থীদের আনন্দ যোগায়। তারা বন্দী। কাঁচ ও তারের বেড়া থাকার জন্যে তারা উড়ে চলে যেতে পারছে না। প্রজাপতির ঘরটা লম্বায় প্রায় ১৫০ ফিটের মত হবে

www.pathagar.com

এবং প্রস্থে হবে ৬০ ফিট। যখন আমি ১৯৯৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কুয়ালালামপুরে মালয়েশিয়া ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলাম তখন ফেরার পথে মালয়েশিয়ার মালাকা স্টেটে একটি প্রজাপতি পার্ক দেখেছিলাম ৯ ডিসেম্বর। সেটি অবশ্য এর চেয়ে অনেকখানি বড় ছিল।

প্রজাপতির বিভিন্ন বর্ণ পাখায় নানা ধরনের কারুকার্য ও চিত্র মনকে উৎফুল্ল করে তোলে। হাজার হাজার প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে মনের আনন্দে। পর্যটকগণ শুধু দেখতে পারবে কিন্তু ছুঁতে পারবে না। অন্য ঘরটাতে রয়েছে হরেক রকম রঙিন ছোট ছোট পাখী ও মাছ। ৫০ ক্রোনার দিয়ে টিকেট কেটে ভেতরে যেতে হয়। আমি সিনিয়র নাগরিক হিসেবে ৩০ ক্রোনার দিয়েই প্রবেশ করা সুযোগ পেলাম। সুইডেনে বয়স্কদের জন্যে এ ধরনের অনেক সুযোগ-সুবিধা আছে যার বিবরণ আগেই দিয়েছি।

প্রজাপতি পার্কে ছোট ছোট স্মৃতি স্মারক উপহার সামগ্রী যথা-প্রজাপতি ক্লিপ, চা কিংবা কফির মগ, চিরুনী, চাবির রিং ছবির পোস্টকার্ড ইত্যাদি কেনা যায়। অনেকেই স্মৃতি ধারণের জন্যেই কিনে নিয়ে যায়। আমিও আমার কনিষ্ঠ জামাতা ডক্টর নিজামউদ্দিন আহমেদের জন্যে একটা কফির মগ কিনলাম তার মগের মুল্লুকের সঞ্চিতির ভান্ডার আরো একটু বাড়ানোর জন্যে। মগ সংগ্রহ করা ডক্টর নিজামের দীর্ঘদিনের শখ এবং তার বাসভবনে দেশী-বিদেশী হাজারো মগ থরে থরে সাজানো আছে। বিখ্যাত প্রযোজক হানিফ সংকেতের 'ইত্যাদি' প্রোগ্রামে মগের মুল্লুকের উপর একটা চমৎকার প্রতিবেদন জাতীয় টেলিভিশনে একবার দেখানো হয়েছিল। তাই ডক্টর নিজামের মগের মুল্লুককে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সুইডেনের হাগা পার্কের একটা মগ কিনে ফেললাম॥

ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল এবং এই বৃষ্টি উপেক্ষা করেই লোকজন চলাফেরা করছে। আমরাও তাই করলাম। বৃষ্টি হওয়া মানেই তাপমাত্রা ০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপর কিন্তু আবহাওয়ায় আর্দ্রতার দরুন সব কিছুই ভেজা ভেজা মনে হচ্ছিল। তাই একটু অস্বস্তিকর লাগে। বাসে উঠলে অবশ্য সমস্ত অস্বাচ্ছন্দ্য দূর হয়ে যায়। এখানকার বাসে ভীড় হয় না বললেই চলে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে বাস একদম সময়মত আসে। সেকেন্ডের সময় ধরে চলে। তাই ভীড় জমে যাবার অবকাশ থাকে না। শহরের মধ্যে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে বাস চলবে এটা কিভাবে সম্ভব? এই প্রশ্নটা আমাদের দেশে অনেকেই হয়ত করবেন। তবে শুনুন-শহরের মধ্যে জনাকীর্ণ স্থানে এবং যে অঞ্চলে ভীড় বেশী হয় সে অঞ্চলে বাসের লেইন আলাদাভাবে চিহ্নিত করা থাকে। বাসের জন্য চিহ্নিত রাস্তাতে কোন গাড়ী প্রবেশ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনেক সময় দেখেছি যে, আমরা বাসে বসে স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে এগিয়ে চলেছি আর আমাদের

www.pathagar.com

উভয় পাশেই লম্বা গাড়ীর লাইন ঠায় দাড়িয়ে আছে। এখানে জন সাধারণের সুবিধার দিকে সরকার অত্যন্ত কড়া নজর দেয়। চীন দেশেও দেখেছিলাম যে, সরকার জনসাধারণের সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেয়। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাইস এডমিরাল মোজাফ্ফর হাসানের সাথে রাষ্ট্রীয় সফরে পাকিস্তান নেভীর একটা ডেলিগেশনের সাথে পিকিং, সাংহাই ও অন্যান্য শহর দেখার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে বড় রাস্তাতেও পথচারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো। পথিকের অসুবিধা হতো বলে গাড়ীর হেডলাইট জ্বালানো নিষিদ্ধ ছিল।

আমরা বাসে করে টেনস্টার দিকে যাচ্ছি। রাস্তার পাশেই বনভূমি এবং দেখলাম কঠিন শিলা কেটে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। শিলার গাত্রে সুন্দরভাবে রঙ লাগিয়ে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরা সুন্দরের পূজারী এবং সব সময়ই সব কিছু নিখুঁতভাবে করতে চায় ও রাখতে চায়। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার সচেতনতা সুইডেনে বিশেষ করে স্টকহল্‌মে এত প্রখর যে, পার্ক, রাস্তাঘাট, স্টেশন ও বাজার এলাকাতেও কোন প্রকার অপরিচ্ছন্নতার ছাপ পাওয়া যায় না। শুধু বাহ্যিক দিক থেকেই নয় মন ও মানসিকতার দিক থেকেও আনন্দঘন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ সৃষ্টির জন্যেও তারা থাকে সদা জাগ্রত। এটাই বর্তমান সুইডেনের কৃষ্টিস্বরূপ। স্টকহল্‌মকে এরই জন্যে ১৯৯৮ সনে ইউরোপের সাংস্কৃতিক জগতের রাজধানীর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে, ২০০৪ সনে বিশ্ব অলিম্পিক গেমস পরিচালনার মর্যাদাও সুইডেনই পাবে।

একটা স্টপেজে দেখলাম যে, ৪ জন স্কুলের উঁচু শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী উঠল। ২ জন বাসের পেছন অংশে চলে গেল আর ২ জন সামনে থাকলো। তাদের হাতে ছিল কিছু ফর্ম ও পেন্সিল। তারা ঐ ফর্মগুলো একটা একটা করে যাত্রীদের নিকট বিতরণ করল এবং একটি করে পেন্সিল দিতে চাইল। অনেকেই ফর্ম নিল কিন্তু পেন্সিল নিল না। যারা ফর্ম নিল তারা তা পূরণ করে দিল এবং পেন্সিল নিয়ে থাকলে তাও ফেরত দিল। হাশেম সাহেবের হাতেও একটা ফর্ম এসেছে এবং দেখলাম তিনি নিজের নাম-ঠিকানা লিখলেন এবং কিছু জায়গায় টিক ও কিছু জায়গায় ক্রস লাগিয়ে ফর্মটি মেয়েটির হাতে ফেরত দিলেন। হাশেম সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন যে, এই রুটে বাস সার্ভিস কেমন, সময়সূচী মেনে চলে কিনা, যাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি, মন্তব্য ও সুপারিশ ইত্যাদি নিয়ে একটা জরিপ করা হচ্ছে। এ দেশে অহরহই এ ধরনের জরিপ করা হয়। জনগণের নিকট থেকে দেশের বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি মতামত গ্রহণের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলাই এসব জরিপের উদ্দেশ্য।

কিসতা থেকে টেনস্টা যাবার পথে বাস একটা ইনডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের পাশ দিয়ে গেল। পাহাড়ের ঢালুতে বনভূমির মধ্যে কিছু কিছু অংশ পরিষ্কার করে এক একটা শিল্প স্থাপন করা হয়েছে। একটা ফ্যাক্টরির পরই আবার বনভূমি এবং একটু

www.pathagar.com

দূরে আর একটি ফ্যাক্টরি। এ ভাবেই ব্লক ব্লক করে শিল্প ও বনভূমি এমন ভাবে পরিকল্পিত ভাবে সাজানো হয়েছে যে, মনেই হয় না এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল আছে। এখানে দেখলাম 'নকিয়া' মোবাইল ফোনের ফ্যাক্টরি, আই বি এম ইলেকট্রনিকস্ ও কম্পিউটার ফ্যাক্টরি, ফিলিপস্, এরিকসন, মাইক্রোওয়েভ কমিউনিকেশন ইত্যাদির ফ্যাক্টরিসমূহ। প্রত্যেকটি উৎপাদন অঞ্চলের পরই একটি করে বনভূমির ব্লক শব্দ দোষণ থেকে অঞ্চলটিকে মুক্ত রাখছে। সমস্ত শিল্পগুলো ছড়ানো অবস্থায় থাকার দরুন ধোঁয়া ও শিল্প বর্জ্য মোটেই নজরে আসে না। অকারণ লোকভীড় ও হৈ-হুল্লোড় থেকেও অঞ্চলটি মুক্ত। তাই সমগ্র এলাকাটা বেশ ছিম ছাম থাকে।

আমরা যথাসময়ে আমাদের আজকের সকালবেলার সফরসূচী শেষ করে জুমার নামাজ আদায় করার জন্যে টেনস্টাতেই অবস্থিত ইরিথ্রিয়ানদের মসজিদে গেলাম।

।। ১৫ ।।

কুংস্ট্রাড গার্ডেন ও সারগেলটর্গ

আনন্দ স্ফূর্তির শহর স্টকহল্ম কিন্তু সে আনন্দে অশ্লীলতা ও উন্মাদনা নেই। আনন্দ করতে করতে খেই হারিয়ে জাপটা জাপটি কিংবা ঝগড়াঝাটি হয়েছে কিংবা আনন্দ করার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবাহে অশ্লীল ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে কিংবা লুটপাটের সুযোগ করে নিয়েছে এরূপ ঘটনা সুইডেনের ইতিহাসে বিরল। এখানে আনন্দ বলতে নির্মল আনন্দ বুঝায় এবং সে ধরনের আনন্দ উপভোগ করার ব্যবস্থা এ দেশের স্থানীয় সরকার, পৌরসভা কিংবা ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা করে রেখেছে। স্টকহল্ম শহরে ১০ লক্ষ লোকের জন্যে ৩০ টা থিয়েটার, ৭০ টা মিউজিয়াম, ৭০টা সিনেমা হল, ১০০ এর উপর চিত্রশালা ও বিভিন্ন চারুশিল্প প্রদর্শনী বিদ্যমান। তা ছাড়া আছে ছোট-বড় ৭০০ এর উপর রেস্তোরাঁ, যেখানে নৃত্য ও গানের ছন্দ ও সুরের আমেজে বন্ধু-বান্ধবী পরিবেষ্টিত হয়ে পানাহার করা যায়। দীপপুঞ্জে ভ্রমণের অবারিত সুযোগ, খেলাধূলোর অফুরন্ত ব্যবস্থা, দেশের সর্বত্র নির্ভাবনাময় ছুটি উপভোগ করার সুবিধা, সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণ এবং ঘন নীল জলে অবগাহন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আনন্দঘন পরিবেশের সাথে মিশে যাবার সুযোগ এখানে অফুরন্ত।

আমরা পর্যটক হিসেবে এলেও পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় গ্রহণযোগ্য সাধারণ আনন্দ উপভোগ করতেও আমাদের কৃষ্টিতে বাঁধে। নৈতিকতার চাপে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিচরণ নিষিদ্ধ। তাই অনেক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনী আকর্ষণীয় মনে হলেও

www.pathagar.com

আমাদের এড়িয়ে চলতে হয়। আর রেস্তোরাঁতে যেয়ে খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কি খেতে কি খেয়ে ফেলব? আর তা ছাড়া শেলীর রাজত্বে বাস করে প্রয়োজনের চেয়ে ৪ গুণ খেয়ে আর কোথাও খেতে পারা অসম্ভব। তাই আমাদের তালিকায় আছে এ দেশের ইতিহাস জানার জন্যে মিউজিয়াম দেখা, শহর, বন্দর দেখার জন্যে বাসে-ট্রেনে ভ্রমণ করা, এ দেশের জীবনযাত্রা কেমন তা দেখার জন্যে চোখ খুলে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা এবং পর্যটকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশের সমস্যাবলী, দোষ ও গুণসমূহ তলিয়ে দেখা। গত ৭ দিন ধরে আমরা তাই করছি।

৯৬০০০ হ্রদের দেশ হচ্ছে সুইডেন। মেলারেন হ্রদ হচ্ছে এদেশের তৃতীয় বৃহত্তম হ্রদ। এই হ্রদেরই বেশ কয়েকটি দ্বীপে স্টকহল্‌ম শহরটি অবস্থিত। মেলারেন হ্রদ দেখতে বেরুলাম ৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সনে। ১১০ কিলোমিটার লম্বা মেলারেন হ্রদ চারদিকে শাখা-প্রশাখা মেলে সমগ্র মেলারেন উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে। স্টকহল্‌ম থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে এই হ্রদটি প্রায় ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ম্যারিফ্রেডের নিকট লেকটি উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৩০ মাইল চওড়া। এখানে মেলারেন হ্রদকে সমুদ্রের মতই মনে হয়। এই বিশাল মেলারেন হ্রদই পূর্বপ্রান্তে এসে তার নীল কোমল বাহু দ্বারা আদর করে জড়িয়ে ধরে আছে স্টকহল্‌মকে। স্টকহল্‌মের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এই মেলারেন হ্রদেরই অবদান।

মেলারেন উপত্যকায় অবস্থিত মেলারেন হ্রদ ঘিরেই সুইডেনের জাতিসত্তা, এর সভ্যতা ও কৃষ্টির বিকাশ ঘটেছে। এই হ্রদটিতে ৩০০ এরও অধিক দ্বীপ রয়েছে। স্টকহল্‌মের অদূরে বিরকা দ্বীপটিতে সুইডেনের প্রথম বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং এখানেই ৮৩০ খৃস্টাব্দে প্রথম গীর্জা নির্মিত হয়। ভাইকিংদের সুরক্ষিত জলভূমি ছিল এই মেলারেন হ্রদ। এই হ্রদে চরে চরেই সমুদ্র যাত্রায় পারদর্শী হয়ে ওঠে ভাইকিংগণ এবং বিরকাই ছিল ভাইকিংদের আদি দ্বীপ। সম্প্রতি বিরকাতে ভাইকিংদের গোরস্তানের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে এবং প্রায় ৩০০০ ভাইকিংদের কবর ওখানে আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মেলারেন হ্রদের দক্ষিণ তীরে ম্যারিফ্রেডের নিকট লাগেস্টাতে গ্রিপস্‌হোল্‌ম দুর্গ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্মিত হয়। এস এস ম্যারিফ্রেড জাহাজে করে স্টকহল্‌ম থেকে ৪ ঘন্টায় গ্রিপস্‌হোল্‌ম দুর্গে পৌঁছা যায়। রাজা গুষ্টভ ভাসা ষোড়শ শতাব্দীতে এই দুর্গকে আরো সুরক্ষিত করেন এবং গ্রিপস্‌হোল্‌ম রাজপ্রাসাদকে স্বীয় বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে এই দুর্গ রাজাদের বন্দীশালা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল। রাজা এরিক XIV এখানেই বন্দী জীবন কাটিয়েছিলেন।

আমরা সকাল ১০ টার মধ্যেই গ্র্যান্ড হোটেলের সামনের জেটিতে পৌঁছলাম এবং জানলাম যে, বেলা ১১টায় একটা প্রমোদ ভ্রমণ শুরু হবে এবং তরীটি ৩ টাতে ফিরে আসবে। দিনটা ছিল রোদে ঝলমল। অত্যন্ত কনকনে শীত থেকে ধারণা

www.pathagar.com

করতে পারছিলাম যে, তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কয়েক ডিগ্রী নিচেই হবে। বাইরে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ানো যাচ্ছিল না। হাতে ঘন্টাখানেকের মত সময় তাই ভাবলাম কুংস্ট্রাড গার্ডেন এবং সারগেলটর্গ দেখে আসি।

লেকের ধার স্ট্রমেন থেকে শুরু হয় কুংস্ট্রাড গার্ডেন অর্থাৎ রাজার বাগান। এর উত্তর সীমানা হচ্ছে 'হামগাটেন' রাস্তা পর্যন্ত। ষোড়শ শতাব্দীতে এটা ছিল রাজকীয় প্রমোদ উদ্যান এবং শুধুমাত্র রাজ পরিষদের সদস্য ও অমাত্যবৃন্দের ব্যবহারের জন্যেই ছিল উন্মুক্ত। বর্তমানে এই বাগান হচ্ছে জনসাধারণের বাগান। গ্রীষ্মকালে এখানে মুক্ত আকাশের নিচে কফি হাউস, ছোট ছোট রেস্তোরাঁ এবং নাচ-গানের আসর বসে। পার্কটি তখন জনসাধারণের আনন্দ মেলায় পরিণত হয়। এই পার্কটি প্রস্থে বড়জোর ২০০ ফিট হবে এবং লম্বায় ২০০ গজ হবে। আমরা উত্তর প্রান্তে হামগাটেন রাস্তায় পৌঁছে বাম দিকে মোড় নিলাম এবং কিছুদূর গিয়েই পৌঁছে গেলাম সারগেল টর্গে অর্থাৎ সারগেল স্কোয়ারে।

সারগেলটর্গের চারদিকে গড়ে উঠেছে বর্তমানে কোটি কোটি টাকার শপিং সেন্টার এবং এখানেই স্টকহল্মের মুক্তাঙ্গন অবস্থিত যা অনেকটা লন্ডনের হাইড পার্কের মুক্ত বক্তৃতা মঞ্চের মত। এখানে যা খুশি বলে যান কেউ বাঁধা দেবে না। তাই এটাকে বলা হয় ক্রুদ্ধ মানুষের বাক স্বাধীন উদ্যান। স্বদেশী কিংবা বিদেশীদের গালি দেয়া, সমকামী পুরুষ কিংবা মেয়েদের সমর্থন যোগানো, স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষে জোর বক্তব্য রাখা এবং এ ধরনের বহু সমস্যার আলোচনা এখানে হয়। তসলিমা নাসরিনের ভক্তরা এখানে বাংলাদেশে মেয়েদের স্বাধীনতা নেই বলে গলা ফাটায়। এখানে যুক্তি দিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। এটা হচ্ছে ক্রোধ নিবারণের স্বীকৃত স্থান। এখানে বক্তৃতা দেবার কিংবা শোনার জন্যে কোন বিজ্ঞাপন দেবার প্রয়োজন পড়ে না। যাদের ইচ্ছে বলেন ও যাদের ইচ্ছে শোনেন। বক্তৃতার পর বক্তব্যের কোন ফল হল কিনা এটা বক্তার দেখবার বিষয় নয়। বক্তব্যের কার্যকারিতা বক্তৃতার পরই শেষ হয়ে যায়। আমাদের দেশেও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ ঢাকাতে বায়তুল মোকাররমের পশ্চিম পাশে এবং সেক্রেটারিয়েটের পূর্ব পাশে মুক্তাঙ্গন বলে এক চিলতে পার্ক তৈরি করেছিলেন। সেখানে গালাগালি করে গলা ফাটালেও কোন বিরূপ মনোভাব নেয়া হবে না এই ছিল মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষ্টিতে তা সইল না। আমাদের দেশে শহীদ মিনার থেকে যেমন কোন প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয় এবং শেষ হয় অনুরূপভাবে সারগেলটর্গ থেকেও প্রতিবাদ মিছিল বের হয়ে থাকে। তবে প্রতিবাদ মিছিলের ধরন এখানে অন্যরূপ। নীরব পদচারণা ও পথ ভ্রমণ দাঙ্গা-ফ্যাসাদ ও ভাঙ্গচুর নয়।

সারগেলটর্গ (সারগেল স্কোয়ার) হচ্ছে বর্তমানে শহরের কেন্দ্রবিন্দু যা একটি অতিকায় চতুষ্কোণ কাঁচের স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত করা আছে। চত্বরের মধ্যে একটা

www.pathagar.com

ফোয়ারা এবং চারদিকের জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকাসমূহ এই অঞ্চলের সম্ভ্রম বিশেষভাবে বাড়িয়ে দেয়।

সারগেলটর্গের দক্ষিণ প্রান্তে কুলচার হুসেট অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ভবনটি অবস্থিত। প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী কুলচার হুসেট দেখতে আসে। এখানে আছে বিরাট লাইব্রেরী। সুইডেনের ও বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই সমস্ত নামী দামী পত্রিকা এখানে পাওয়া যায়। সুইডেনের উপর নানা ধরনের অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট এখানে বসেই দেখা যায় ও শোনা যায়। আমরা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে চলে এলাম মেলারেন লেকের ধারে। এখনও প্রমোদ তরীটি ছাড়ার ১০ মিনিট বাকী। ৪ ঘন্টা ব্যাপী মেলারেন হ্রদ ভ্রমণের জন্যে জনপ্রতি ১৩০ ক্রোনার দিয়ে (আমাদের টাকায় প্রায় ১০০০ টাকা) টিকেট কেটে আমরা ধীর গতিতে প্রমোদ তরীটির দিকে অগ্রসর হলাম। জেটি এবং জাহাজের সিঁড়ি কাঁচের মত মসৃণ বরফে আবৃত ছিল। বেশ কিছুক্ষণ ধরেই দেখছিলাম একটা শক্ত ব্রাশ দিয়ে একজন নাবিক ঐ সিঁড়ি ও জাহাজের ডেকে উঠবার স্থানটা ঘষে পরিষ্কার করছিল। নাবিকদের সাহায্যেই আমরা জাহাজে উঠলাম এখন ইন্তেজার শুধু জাহাজ ছাড়বার।

।। ১৬ ।।

মেলারেন হ্রদ ভ্রমণ

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ১১ টায় জেটির শেষ বন্ধন ছিন্ন করে আমাদের প্রমোদতরী ডলফিন XI, ৩৫ জন সহ যাত্রী সহ যাত্রা শুরু করল। সুন্দর এই জাহাজটির ভেতরটা "প্রশস্ত এয়ার বাস' বিমানের মত হেলান উপযোগী ৮ সারি আরামদায়ক সোফা সেটে সজ্জিত। জাহাজটি ৫০ ফিটের মত লম্বা এবং প্রত্যেক সারিতে ৬ জন করে সর্বমোট ৪৮ জন যাত্রী আরাম করে বসে ভ্রমণ করতে পারে। প্রত্যেকটি সারিতে সোফাসেটগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। জাহাজের জানালা থেকে ভেতরের দিকে ৩ টি করে সোফাসেট ডেকের সাথে সেঁটে আঁটকানো আছে। মধ্যে আড়াই ফিট চওড়া চলার পথ আছে। জানালাগুলো লাক্সারি কোচের জানালার মত এবং জাহাজের উভয় পাশটাই শুধু জানালায় ভর্তি। ভেতরে যে কোন স্থানে বসলেই ডান দিক কিংবা বাম দিকের জানালা দিয়ে বাইরের সব দৃশ্যই পরিষ্কার দেখা যায়।

আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের যাত্রাপথের বিবরণ দিয়ে যাচ্ছিল এক সুন্দরী তরুণী পথ প্রদর্শিকা (গাইড)। তার বাচনভঙ্গি ছিল মধুর এবং একই সাথে সুইডিশ, জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় ধারা বিবরণী দিয়ে যাচ্ছিল অনর্গল। এরা সাধারণত পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সনদপ্রাপ্ত বিবরণ দাত্রী। আমাদের পথ প্রদর্শিকা ছিল অত্যন্ত চৌকস. সচেতন ও অভিজ্ঞ। ধারা বিবরণী দেয়ার সাথে সাথে একটু আধটু হাস্যরস ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাত্রীদের উৎফুল্ল করে রাখছিল।

www.pathagar.com

জেটি থেকে জাহাজ ছাড়ার পরপরই আমরা আনুমানিক ১০ মাইল বেগে দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের ডান দিকে কুংলিগাস্নটেট অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ থাকলো। এই প্রাসাদে বর্তমানে রাজা থাকেন না। তিনি থাকেন শহর থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে ড্রটনিংহল্ম রাজপ্রাসাদে।

জাহাজ এগিয়ে চলল। গামলাস্টান দ্বীপটি এবং সর্বপ্রাচীন শহর এলাকা আমাদের ডান দিকে থাকল। এই সেই গামলাস্টান দ্বীপ যেখান থেকে স্টকহল্মের উৎপত্তি। আয়তনে মাত্র ১ বর্গ কিলোমিটার এবং প্রকৃত অর্থেই স্টকহল্মের কেন্দ্রবিন্দু। রাজপ্রাসাদটি দূর থেকে মনে হচ্ছিল যেন রাজকীয় ভাবেই সব কিছুর উপর আধিপত্য বিস্তার করে বিরাজ করছে। গামলাস্টানের সর্বোত্তর কোণে ভারীদর্শন পাথরের ব্লক দ্বারা নির্মিত রাজপ্রাসাদটি দেখলেই সম্ভ্রম জাগে। আমাদের তরুণী বালা গর্বভরে বলছিল যে, এই রাজপ্রাসাদটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজপ্রাসাদ। এই প্রাসাদে ৬০৮ টি কামরা রয়েছে এবং ইংল্যান্ডের বাকিংহাম প্রাসাদে রয়েছে ৬০৭টি কামরা।

আমাদের প্রমোদতরী স্কেপস্হোল্মেন ও কাস্টেল হোল্মেন দ্বীপদ্বয়কে বাম দিকে রেখে উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। ডান তীরে দেখলাম ওসটাসিয়াটিস্কা মিউজিয়াম। আমাদের ধারা বিবরণ দাত্রী (গাইড) জানালো যে, এই মিউজিয়ামটি হচ্ছে প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জাপান, কোরিয়া, ভারত ও চীন থেকে সংগৃহীত চিত্রশিল্পের মিউজিয়াম। এখানে অত্যন্ত মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। গুস্টভ VI এডল্ফ তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে ১৮০০ মূল্যবান চিত্র এই মিউজিয়ামে দান করেন।

ক্যাস্টেল হোল্মেনের সর্বদক্ষিণ প্রান্তে সুবিধাজনক স্থানে একটি দুর্গ রয়েছে। মনে হয় বন্দর প্রহরী হিসেবে দণ্ডায়মান। আমরা এগিয়ে চললাম। আমাদের ডান দিকে থাকল ঝুরগার্ডেন অর্থাৎ মুক্ত চিড়িয়াখানার দ্বীপ যার আয়তন প্রায় ৬/৭ বর্গ কিলোমিটার হবে। মুক্ত চিড়িয়াখানা ছাড়াও এই দ্বীপে রয়েছে বিনোদন পার্ক (গ্রোনা লুন্ড)। কয়েকটি মিউজিয়াম যথা-ভাসা মিউজিয়াম, নরডিস্কা মিউজিয়াম, বায়োলজিস্কা মিউজিয়াম, স্কানসেন মুক্তাঙ্গন মিউজিয়াম এবং সুইডেনের সবচেয়ে উঁচু কাকনাস্টরনেট টাওয়ার যেখান থেকে সারা স্টকহল্ম দেখা যায়। প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকে এই দ্বীপ খুবই প্রসিদ্ধ। সুন্দর বনভূমি এটাকে বনভোজনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে গড়ে তুলেছে। ১৯৯২ খৃস্টাব্দে এই দ্বীপে সারাদিন কাটিয়েছিলাম। আমাদের জাহাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে এবং আমাদের গাইড বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে। তীরে অবস্থিত বিভিন্ন অট্টালিকা, এলাকা, স্ট্রাকচার, ও অন্যান্য দ্রষ্টব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুন্দরী তিনটি ভাষায় অনর্গল বলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে রসিকতা করছে আবার কখনও নিজের দেশের গৌরবে গৌরবান্বিতা হয়ে একটু দম্ভ প্রকাশ করছে।

www.pathagar.com

ভাসা জাহাজটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। বিশ্বের প্রথম যুদ্ধজাহাজ এই তথ্যটি বলে, গুরুত্ব দেবার জন্যে আরও একবার পুনরাবৃত্তি করল। দেখলাম কাঠের পুরোনো দিনের জাহাজটিকে খয়েরী রঙের সংরক্ষণকারী পেইন্ট দিয়ে আবৃত করে রেখেছে এবং লেকের ধারে একটা শুকনো স্লিপওয়েতে তুলে রাখা হয়েছে। এই ভাসা জাহাজটি বর্তমানে পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ। ১৬২৮ খৃস্টাব্দে সুইডেনের রাজা গুস্টভ এডলফাস এই জাহাজটি নির্মাণ করান এবং সুইডেনের গর্ব, সমুদ্রে অজেয় বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, প্রথম সমুদ্র যাত্রাতে বন্দরেই জাহাজটি ডুবে গেল ও ভাসা হারিয়ে গেল এবং মানুষের মন থেকেও এর স্মৃতি মুছে গেল। দীর্ঘ ৩২৮ বছর পর ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে সামুদ্রিক প্রত্নতত্ত্ববিদদের নজরে এসে গেল জলনিম্নে ভাসার ধ্বংসাবশেষ এবং ৫ বছর ধরে উদ্ধার প্রচেষ্টা চালিয়ে ১৯৬১ সনে জাহাজটির ধ্বংসাবশেষ উত্তোলন করা হয়। দীর্ঘ ৩৩৩ বছর জলনিম্নে থাকা এই জাহাজ উদ্ধারের কাজ নিঃসন্দেহে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। ২৪০০০ বিভিন্ন ছোটখাট দ্রব্যাদি এবং জাহাজের খোলের ১৪০০০ কাঠের টুকরো এবং জাহাজের অংশ. ৪০০০০ ঘনফিট কাদা থেকে ধীরে ধীরে উদ্ধার করে একটার সাথে একটা জোড়া লাগিয়ে পুরো জাহাজটিকে পুনঃনির্মাণ করে বর্তমানে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখা হয়েছে। কাছেই এই জাহাজ থেকে উদ্ধারকৃত দ্রব্যাদির জন্যেও একটা যাদুঘর তৈরি করা হয়েছে যেখানে জাহাজের ভোজকক্ষে, রন্ধনশালায় ও বিভিন্ন কামরাতে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির সংগ্রহ আজ দৃশ্যমান।

ঝুর গার্ডেন দ্বীপ অর্থাৎ মুক্ত চিড়িয়াখানার দ্বীপ

www.pathagar.com

আমাদের জাহাজ আরো এগিয়ে চলল। সামনে দেখা গেল জেটি এবং জেটির পেছনেই আমরা দেখতে পেলাম ড্রামাটিকস থিয়েটার (রয়েল ড্রামাটিক থিয়েটার)। অত্যন্ত গর্বের হাসি হেসে তরুণী পরিচারিকা জানাল যে, বিশ্বনন্দিতা অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো এবং এনগ্রিড বার্গম্যান এই থিয়েটার থেকেই অভিনয় জগতে যাত্রা শুরু করেন।

জাহাজ আবার ঘুরল ও স্কেপস্‌হোলমেন দ্বীপকে ডান দিকে রেখে এবং ঝুরগার্ডেনকে বাম দিকে রেখে দক্ষিণপূর্ব মুখী হয়ে আমরা অগ্রসর হলাম। সোডেরমাল্‌মকে ডান দিকে রেখে আমরা একটা সরু খালের মধ্যে ঢুকলাম। খাল ধরে অগ্রসর হচ্ছি তখন ধারা বিবরণকারিণী আমাদের জানাল যে, আমাদের বাম দিকে যে অঞ্চল রয়েছে সেখানে ২০০৪ সালে বিশ্ব অলিম্পিক গেমস্ অনুষ্ঠিত হবে। অলিম্পিক ভিলেজ অর্থাৎ যেখানে অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী দেশের প্রতিযোগীরা থাকবে তাদের জন্যে বাড়ীঘর তৈরির কাজ শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর আমরা একটা লকগেটে এলাম। 'লকগেট' হচ্ছে এমন একটা জলাধার যার দুই প্রান্তে দুটো গেট থাকে। গেট বন্ধ করে দিয়ে পানি প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে। এই জলাধারটির একটা গেট হচ্ছে বাল্টিক সাগরে প্রবেশ করার জন্যে এবং অন্যটি হচ্ছে মেলারেন হ্রদে প্রবেশ করার জন্যে। মেলারেন হ্রদের জলপৃষ্ঠের উচ্চতা বাল্টিক সাগরেব জলপৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে ৩ ফিট বেশী। আমাদের জাহাজ এতক্ষণ বাল্টিক কাপড়ের জলপৃষ্ঠের উপর দিয়ে চলছিল। এখন জাহাজটি কিভাবে মেলারেন হ্রদের জলপৃষ্ঠের উচ্চতায় উঠবে? এই সমস্যা সমাধানের জন্যেই লকগেটের ব্যবস্থা। লকগেট না থাকলে হ্রদের পানি ও বাল্টিক সাগরের পানি একই লেভেলে পৌঁছে যেত এবং হ্রদের সুমিষ্ট পানি লবণাক্ত হয়ে অপেয় ও অব্যবহারযোগ্য হয়ে যেত।

আমাদের জাহাজটিকে লকগেটের ভেতরে ঢুকানোর জন্যে মেলারেন হ্রদের দিকের গেট সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হলো যাতে হ্রদের উঁচুস্তরের পানি বাল্টিক সাগরের নিচু স্তরের পানির দিকে প্রবাহিত না হয়। এবারে জাহাজটি ও আরো দু'চারটা অপেক্ষমান জাহাজ ধীরে ধীরে লকগেটে ঢুকল। লকগেটটি লম্বায় প্রায় ২০০ ফিট এবং প্রস্থে ৪০ ফিটের মত হবে। জাহাজগুলো ঢোকানোর পর বাল্টিক সাগরের দিকের গেটটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হল। এবারে মেলারেন হ্রদের দিকের গেটের নিয়ন্ত্রণযোগ্য দরজা ফাঁক করে দিয়ে গেট অঞ্চলে হ্রদের পানি অনুপ্রবেশ করানো হল। যেহেতু বাল্টিক সাগরের দিকের গেট সম্পূর্ণ বন্ধ তাই লকগেট অঞ্চল থেকে পানি ওদিকে যেতে পারবে না এবং ধীরে ধীরে পানি এসে লকগেটের ভেতরের পানির লেভেল হ্রদের পানির লেভেলের সমান হয়ে যাবে। ভাসমান জাহাজগুলোও তিন ফিট উপরে ভেসে উঠবে। তখন মেলারেন হ্রদের দিকের গেট খুলে দেয়া হবে এবং জাহাজগুলো মেলারেন হ্রদে প্রবেশ করবে। ফেরত যাত্রার

www.pathagar.com

সময় লকগেটে পানির লেভেল মেলারেন লেকের পানির লেভেলের সমান করে জাহাজ ঢুকানো হবে। তারপর লেকের দিকের লকগেট সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং বাল্টিক সাগরের দিকের গেটের নিয়ন্ত্রণযোগ্য ফাঁক দ্বারা পানি ধীরে ধীরে নিষ্কাশন করে লকগেটের পানির লেভেল বাল্টিক সাগরের পানির লেভেলে নামানো হবে এবং তারপর লকগেট সম্পূর্ণ খুলে জাহাজগুলোকে বের করে দেয়া হবে। এ ভাবেই খরস্রোতা নদী যা জলবিদ্যুতের জন্যে বাঁধ দেয়া হয়, তাকে নাব্য রাখতে হলে লকগেটের ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

লকগেট পার হয়ে আমাদের প্রমোদতরী ডান দিকে মোড় ফিরে পূর্বমুখী হয়ে চলতে থাকল। সডারমাল্‌ম দ্বীপ যা আয়তনে প্রায় ৪০ বর্গ কিলোমিটার তা আমাদের ডান দিকে এবং কুংগস্‌হলমেন দ্বীপ আমাদের বাম দিকে থাকল। কুংগস্‌হলমেন দ্বীপের ঢালে আছে ছোট ছোট সুন্দর কুটির যা দূর থেকে ছবির মত দেখাচ্ছিল। ধারা বিবরণকারিণী জানাল যে, এই কুটিরসমূহ লম্বা সময়ের জন্যে ভাড়া দেয়া হয় কিন্তু এর চাহিদা এত বেশী যে, ভাড়া পেতে হলে প্রায় ১০ বছর অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

আরো এগিয়ে রিডারহোলমেন দ্বীপের কাছাকাছি পৌঁছলাম। হ্রদের ধারেই দেখতে পেলাম স্টাডহুসেট (সিটি হল) এবং রিগস্‌ডাগহুসেট (পার্লামেন্ট হাউস) এবং রিডারহোল্‌মস কিকরান (রিডারহোল্‌ম দ্বীপের বিখ্যাত গীর্জা)। এখান থেকেই আমাদের ফেরত যাত্রা শুরু হলো এবং আমরা ৩ টায় জেটিতে এসে পৌঁছলাম। আঁধার তখন নেমে এসেছে।

।। ১৭ ।।

সুইডেনে পার্লামেন্টারি প্রথার শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের ইতিহাস

বর্তমান সুইডেনের অগ্রগতির উৎস বলতে যেয়ে এদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের উল্লেখ আমি করেছিলাম একাদশ পর্বে। সুইডেন থেকে ফেরত যাবার আগে সমাজকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন কেমন তা অবশ্যই দেখতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সোমবার ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে রাস্তায় বেরোলাম। ঝড়ো হাওয়া বইছিল। তাপমাত্রাও ছিল শূন্যের বেশ কয়েক ডিগ্রী নিচে। হাঁটতে-চলতে বেশ অসুবিধাই হচ্ছিল। নরব্রো পুলটি পার হবার সময় মনে হচ্ছিল যেন উড়িয়েই নিয়ে যাবে। গামলাস্টানে পৌঁছলাম এবং মেডেলটিট্‌স মিউজিয়ামে গেলাম। এই মিউজিয়ামটি হচ্ছে স্টকহল্‌মের সর্বশেষ মিউজিয়াম। স্টকহল্‌মের মধ্যযুগীয় জীবনধারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই মিউজিয়ামের প্রদর্শনীর মাধ্যমে। পার্লামেন্ট ভবনের জন্যে মোটরকার গ্যারেজ তৈরি করতে যেয়ে ভূনিম্নে ত্রয়োদশ শতাব্দীর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় এবং ষষ্ঠদশ শতাব্দীর টাউন হলের

www.pathagar.com

ভিত্তিপ্রস্তর নজরে আসে। তারপর গ্যারেজ প্রকল্প বাদ দিয়ে এই স্থানেই মিউজিয়াম তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এভাবেই তৈরি হয় মেডেলটিট্স মিউজিয়াম।

মিউজিয়ামের গেটে গিয়ে শুনলাম যে আজ বন্ধ। অগত্যা সেখান থেকে এগিয়ে গেলাম কুংলিগাস্লটেট রাজপ্রাসাদ দেখতে। বিধি বাম আজকে। রাজপ্রাসাদের গেট থেকে বলে দিল যে, সংস্কার কাজ চলছে তাই রাজপ্রাসাদ বর্তমানে বন্ধ। ৬০৮ কামরা বিশিষ্ট বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই রাজপ্রাসাদটি আমাদের দেখা হবে না। ১৬৯৬ সালে এই রাজপ্রাসাদটি আগুন লেগে পুড়ে যাবার পর ১৭৫৪ খৃস্টাব্দে এই প্রাসাদটি বর্তমান আকারে নির্মাণ করা হয়। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, ৭০০ হীরক বসানো অমূল্য মুকুট, প্রাসাদের ভেতরের মিউজিয়াম, অস্ত্রাগার এবং প্রাচীন রাজকীয় দ্রব্যসামগ্রী দেখা হল না।

আমরা গামলাস্টানের পথঘাট দেখতে গেলাম। রাজপ্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে স্টকহল্মের সর্ব পুরাতন গীর্জা স্টরকিরকান দেখলাম। এই গীর্জাটির সাথেই দক্ষিণ দিকে একটা চত্বর আছে যা স্টরটরগেট অর্থাৎ বৃহৎ চত্বর নামে পরিচিত। এই চত্বরের ইতিহাস হচ্ছে যে, রাজা ক্রিস্টিয়ান II ১৫২০ সালে ৮০ জন গণ্যমান্য ব্যক্তির শিরচ্ছেদ করেন এই চত্বরে। এই ঘটনাকে সুইডেনের ইতিহাসে নৃশংস রক্তস্নান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। স্টরটরগেট চত্বরেই ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে নির্মিত বরসন অর্থাৎ স্টক একচেঞ্জ অবস্থিত। প্রতি বছর এই বরসনেই সুইডিশ একাডেমীর বৈঠক বসে এবং আলাপ-আলোচনার পর সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার দ্বারা কাকে ভূষিত করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়।

বরসন থেকে অতি সরুপাথর বসানো রাস্তা ধরে উত্তর দিকে রওয়ানা হলাম। মিনিট দশেক পরই আমরা পার্লামেন্ট ভবনের সামনে উপস্থিত হলাম। একটু খোঁজ নেবার পর জানতে পারলাম যে, আমাদের যেতে হবে রাস্তার পশ্চিম পার্শে। ওখানে স্ট্যান্ডিং কমিটি রুম, পাবলিক গ্যালারী, সংসদ সদস্যদের অফিস কক্ষসমূহ রয়েছে। সে দিকেই গেলাম ও একটা বড় দালানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম প্রধান প্রবেশ ফটক বন্ধ। কলিং বেল টেপার পর সুইডিশ ভাষায় কিছু কথা শোনা গেল। আমাদের পথ প্রদর্শিকা, হাশেম সাহেবের কন্যা রিতা, আমাদের নিয়ে বিল্ডিং-এর দক্ষিণে একটা পার্শ্ব গেটের দিকে গেল। গেট খুলে নিচতলায় এক বিরাট হলে ঢুকলাম। সুন্দরভাবে সাজানো অন্তত ৫০ টা সোফাসেট আছে কিন্তু লোকজন নেই। ২জন অফিসার কর্তব্যরত ছিল। আমরা কোত্থেকে এসেছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য কি তা জানাতে এক অফিসার আমাদের তদারক করতে লেগে গেল। ওভারকোট খুলে কোথায় ঝুলিয়ে রাখব, টুপি, স্কার্ফ, হাতব্যাগ, এবং অন্যান্য কাগজপত্রই বা কোথায় রেখে যাব এ সব টুকিটাকি খবর জানিয়ে আমাদের তৈরি

www.pathagar.com

হতে বলল। তার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তৈরি হলাম এবং হাত-মুখ ধুয়ে সম্পূর্ণ তরতাজা হয়ে অফিসারটির নিকট গেলাম।

তিনি প্রথমেই আমাদের একটা তথ্য লিপিকা দিলেন। আমরা পড়ে দেখলাম যে, সুইডেনের পার্লামেন্টে স্পীকার ও ৩ জন ডেপুটি স্পীকার ৪ বছর মেয়াদের জন্যে নির্বাচিত হন। পার্লামেন্টে সর্বমোট সদস্য হচ্ছে ৩৪৯ জন এবং বর্তমানে মহিলারা শতকরা ৪৪ ভাগ আসন দখল করে আছেন। এটাই পৃথিবীর যে কোন দেশের সংসদে মহিলাদের দ্বারা দখলকৃত সর্বাধিক আনুপাতিক হার। তথ্য লিপিকা থেকেই জানলাম যে, পার্লামেন্টের কার্যক্রমের পরিকল্পনা ১৬ টি স্ট্যান্ডিং কমিটি তৈরি করে থাকে এবং প্রতিটি কমিটিতে ১৭ জন করে সদস্য থাকেন। স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যসমূহ, পার্লামেন্টে বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যার আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হয়ে থাকে। জাতীয় সংসদ আমাদের দেশের মতই আইন পাশ করে, ট্যাকস্ নির্ধারণ করে, জাতীয় বাজেট পাশ করে এবং দেশ পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করে থাকে।

অফিসারটির সাথে আমরা চললাম এবং তিনি লিফ্‌টে করে আমাদের ৪ তলায় নিয়ে গেলেন এবং সংসদ অধিবেশন হলের পেছনের ব্যালকনির সীটে আমাদের বসিয়ে দিলেন। এখান থেকে নিচে উপবিষ্ট সংসদ সদস্যদের দেখা যায় এবং ইচ্ছে করলে ছবিও তোলা যায় তবে ফ্ল্যাশ ব্যবহার করা যায় না। শুধু পার্লামেন্ট নয় স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং-এও জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। এখানে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, জাতীয় পার্লামেন্ট চলাকালে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে।

মোটা কার্পেটে আবৃত গ্যালারীতে নরম সোফা সেটিতে বসে ক্লান্তি দূর করার সময় অধিবেশনের কার্যক্রম দেখছিলাম এবং সেই সাথে সাথে হলটার নানা দিকেও দৃষ্টি ফেরাচ্ছিলাম। ৫৫০ সিটের হলটিতে প্রথম দুই সারিতে সারি প্রতি ১২ জোড়া করে মোট ২৪ জোড়া সিট রাখা হয়েছে। পেছনের দিকে হলটার প্রস্থ বেশী তাই একদম পেছনের সারিতে ২০ জোড়া সিট রয়েছে। সিটগুলো এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, ঢুকতে ও বেরিয়ে আসতে কোন অসুবিধা না হয়। আমাদের সংসদ ভবনের সীটগুলো লাইন ধরে সিনেমা হলের মত করে রাখা আছে বলে ঢুকতে ও বেরিয়ে আসতে একটু অসুবিধা হয়। তথ্য লিপিকাতে দেখতে পেলাম যে, প্রতি বছর ১০০,০০০ দর্শনার্থী এই সংসদ ভবন দেখতে আসে।

আমরা প্রায় ৪০ মিনিট ভেতরে ছিলাম। অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে বক্তৃতা হচ্ছিল এবং শ্রোতারাও অত্যন্ত মনোযোগ সহকারেই বক্তৃতা শুনছিলেন। কোন বাকবিতণ্ডা নেই, কোন শোরগোল নেই। আমাদের দেশের মত হৈ চৈ নেই। খুব

www.pathagar.com

সম্ভব টিটকারিমূলক উক্তিও নেই। পরিবেশ থেকেই মনে হয় সভ্য দেশে বসে আছি।

হল থেকে বেরিয়ে দেখি যে, একজন অফিসার আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমরা তার সাথে চললাম এবং যেতে যেতে দেখলাম একটা বেশ বড় কামরায় কিছু দর্শনার্থী সংসদ ভবনের ভেতরের ছবি দেখছে একটা বড় সিনেমার পর্দায় এবং একজন অফিসার মাঝে মাঝে কিছু ব্যাখ্যা করছে। বুঝতে পারলাম যে, এভাবেই পর্যটকদের দেখানো হয়। আমরা বিদেশী বলে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছি যে, আমাদের হলের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়েছে।

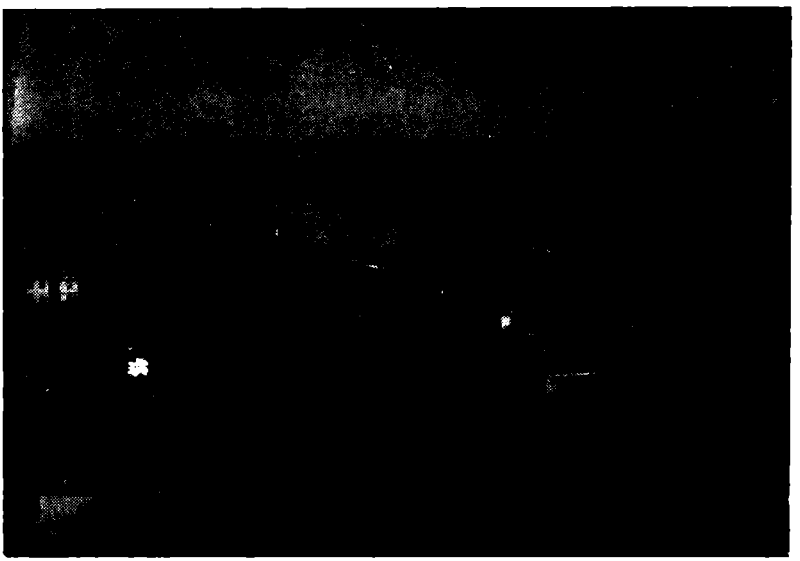

পার্লামেন্ট ভবন এপারে অন্য পারে সিটি হল

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে আমরা সুইডেনের পার্লামেন্ট ভবন দেখছি এবং পার্লামেন্টারী প্রথায় রাজ্য শাসন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছি। কিন্তু এর উৎপত্তি কোথায় তা জানতে গেলেই সুইডেনের বীর সৈনিক এনগেলব্রেকির কথা বলতে হয়। চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে জার্মানি ধীরে ধীরে ইউরোপে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং স্ক্যানডেনেভিয়ার দেশসমূহ এই প্রভাব প্রতিরোধ করার জন্যে ১৩৯৭ সালে সুইডেন ডেনমার্ক ও নরওয়েকে নিয়ে "কালমার ইউনিয়ন" স্থাপন করে। ডেনমার্কের রাণী মার্গারেটা এই ইউনিয়নের প্রধান হন এবং ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো নিয়ে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা সেকালে ইউরোপের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ডেনদের দাপটে সুইডেনবাসী অতিষ্ঠ ওয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

তারা ডেনমার্কের প্রভুত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং ১৪৩০ খৃস্টাব্দে এনগেলব্রেকির নেতৃত্বে "কালমার ইউনিয়ন" থেকে বেরিয়ে আসে। ১৪৩৫ খৃস্টাব্দে এনগেলব্রেকিই সুইডিশ ইতিহাসে প্রথম পার্লামেন্ট অধিবেশন আহবান করেন এবং বিধান সভা গঠন করেন। এই বিধান সভায় অভিজাত শ্রেণীর লোক, ধর্মযাজক, বুর্জোয়া শ্রেণীর লোক এবং কৃষিকর্মে লিপ্ত কিছু লোক শামিল ছিল। এনগেলব্রেকি পার্লামেন্টের মাধ্যমে নূতন শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। তিনি নিজেই সুইডেনের রিজেন্ট হিসেবেও মনোনীত হন। এই জনপ্রিয় নেতা কিন্তু বেশী দিন নেতৃত্ব দিতে পারলেন না। অল্প কিছুদিন পরই তাঁর অনুচরদের হাতেই তিনি নিহত হলেন। কিন্তু রিকসডাগ অর্থাৎ পার্লামেন্ট খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ১৫২০ খৃস্টাব্দ অবধি চলল। তারপর রাজা ক্রিস্টিয়ান II সুইডেনবাসীর হাতে নির্বাচিত হলেন। তিনি ছিলেন অত্যাচারী। তিন বছরেরও অধিক কাল ধরে অকথ্য অত্যাচার চালান এবং সুইডেনের সম্ভ্রান্ত পরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করতে থাকেন। ১৫২৩ [illegible] রাজা ক্রিস্টিয়ান II। এই অত্যাচার রোধ করার [illegible] 'ম্যান' (অভিজন) সুইডেনের ডালার্না [illegible] সাহায্যে নিষ্ঠুরতার অবসান ঘটান এবং ১৫২৩ [illegible] বসেন এবং [illegible] প্রতিষ্ঠা করেন।

[illegible]

নবেল পুরস্কার বিতরণ কেন্দ্র স্টাডহুসেট

কুংগসহলমেন দ্বীপের পূর্ব প্রান্তে স্টাডহুসেট অর্থাৎ সিটি হলটি অবস্থিত। স্থপতি র‍্যাগনার ওটসবার্গ এমনভাবে তাঁর স্থাপত্যকর্মকে ফুটিয়ে তুলেছেন যেন মনে হয় সিটি হল ভবনটি মেলারেন হ্রদের ঘন নীল জল ভেদ করে আকাশ ছুঁতে চাচ্ছে। পার্লামেন্ট ভবন থেকে স্টাডহুসেট অর্থাৎ সিটি হল অতি নিকটে। মেলারেন হ্রদের ধার দিয়ে পায়ে হেঁটে গেলে পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই পৌঁছা যায়। আমরা স্টাডহুসেট থেকে পথে নামলাম এবং লেককে বাঁয়ে রেখে সিটি হলের নিম্ন স্তরে পৌঁছলাম। সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে সিটি হলের প্রশস্ত চত্বরে এলাম। বড় ফটক পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম এবং সিটি হলের কাঁচ দ্বারা আবৃত গম্বুজ আকৃতির হর্ম্য যাকে "ব্লু হল" বলা হয়, সে অঞ্চলে এলাম। এই ব্লু হলেই নোবেল পুরস্কার প্রাপকদের জন্যে প্রতি বছর ১০ ডিসেম্বর এক নৈশভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

www.pathagar.com

স্টকহলম স্টাডহুসেট অর্থাৎ সিটি হল

নোবেল প্রাইজের কথা উঠলেই সুইডেনের কৃতী সন্তান, সুইডেনের গর্ব আলফ্রেড নোবেল বার্নহার্ড (১৮৩৩-১৮৯৬) এর কথা এসে যায়। তিনি ছিলেন একজন পেশাগত রসায়নবিদ। পরে তিনি ডিনামাইটের উদ্ভাবক হিসেবে বিশ্বে খ্যাতিলাভ করেন এবং সেই সাথে বিশ্ব ইতিহাসের একজন খ্যাতনামা মানব হিতৈষী, জনদরদী এবং উদারপন্থী মনীষী হিসেবে আখ্যায়িত হন। এই মহান পুরুষের জন্ম স্টকহলম শহরেই। প্রথম যৌবনে রাশিয়ার সেন্ট পিটারস্‌বার্গ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী প্রাপ্তির পর তিনি সুইডেনের হেলেনবার্গ শহরে তাঁর পিতার মাইন, টর্পেডো, এবং বিস্ফোরক ব্যবসায়ে যোগ দেন। আলফ্রেড নোবেল বিস্ফোরক ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের উদ্ভাবনের আশায় নাইট্রো-গ্লিসারিন-এর উপর কাজ শুরু করেন। এই অতিশয় বিপজ্জনক পথে চলতে যেয়ে তাঁরই ফ্যাক্টরিতে এক বিস্ফোরণে তাঁর ছোট ভাই ও চার বন্ধু প্রাণ হারায়। আলফ্রেড নোবেলকে তখন অনেকেই এই বিপদসঙ্কুল ভয়ঙ্কর পথ পরিহার করার উপদেশ দেয় কিন্তু তিনি সমস্ত উপদেশ উপেক্ষা করেই নাইট্রো-গ্লিসারিনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে গবেষণা শুরু করে দিলেন। এই গবেষণার ফলেই ডিনামাইট আবিষ্কৃত হয়।

সারা জীবন এই কর্মবীর শুধু কাজই করে গেছেন এবং মৃত্যুর সময় তিনি রেখে গেলেন ৯ মিলিয়ন ডলারের অগাধ সম্পত্তি। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উইল করে রেখে যান এবং ধন-দৌলতের নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে যান এবং প্রতি বছর সুদ থেকে যে টাকার সমাগম হবে তা ৫ টি সমান ভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত ৫ টি বিষয়ের উপর বিশেষ অবদান রাখার জন্যে প্রতি বছর পুরস্কার

www.pathagar.com

হিসেবে দেয়া হবে। কোন সংস্থা নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করবে তাও বলে যান।

ক. রসায়ন বিদ্যা ..... সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স

খ. পদার্থ বিদ্যা ..... সুইডিশ একাডেমি অব সায়েন্স

গ. সাহিত্য ..... স্টকহল্‌ম একাডেমি

ঘ. চিকিৎসা শাস্ত্র ..... সুইডেনের কারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট

ঙ. মানব বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি। ..... নরওয়ের স্টরটিং

আলফ্রেড নোবেলের লিখিত ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, তিনি বিশেষ ভাবে বলে গেছেন যে কোন পুরস্কার দেবার সময় জাতি, ধর্ম, গোত্র, কিংবা আঞ্চলিকতার প্রশ্ন বিবেচনায় আসবে না। বিবেচ্য বিষয় হবে শুধু মানব কল্যাণে অবদান। কোন এক বিষয়ে ৩ জনের বেশী প্রার্থী হবে না এবং একাধিক হলে পুরস্কারটি সমান ভাগ করে দেয়া হবে।

নোবেল ফাউন্ডেশনের ৬ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড অব ডাইরেক্টর, ২ বছর মেয়াদের জন্যে নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন। এই ৬ জনের মধ্যে ৫ জনই ট্রাস্টি কর্তৃক মনোনীত এবং ষষ্ঠ জন সুইডেনের সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। বোর্ড অব ডাইরেক্টরের সকল সদস্যই সুইডেন কিংবা নরওয়ের অধিবাসী হতে হবে।

সিটি হলের ব্লু হলের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছি কোন দিকে যাব। তখনই দেখলাম এক যুগল পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তাদের জিজ্ঞেস করলাম এই সুন্দর ভবনটির অভ্যন্তরে যাবার অনুমতি কোথা থেকে পাব? তারা যা বলল তাতে সম্পূর্ণ নিরাশ হলাম। তারা জানাল যে, আগামীকাল ১০ ডিসেম্বর, নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের সম্মানার্থে সিটি হলে হবে বিখ্যাত নৈশভোজ যাতে শুধু দেশের রাজা-উজিররাই থাকবেন না, বিদেশী মেহমানও থাকবে প্রচুর। সিটি হল সাজান হচ্ছে, তাই কাউকেই এখন ঢুকতে দেয়া হবে না। দূর থেকে দরজা-জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে যতটা দেখা যায়, দেখতে পারেন। অগত্যা, বাইরে দাঁড়িয়েই দেখতে থাকলাম। হলের ভেতরে দেখলাম যে, নানাজন নানা কাজে ব্যস্ত। কেউবা টেবিল সাজাচ্ছে কেউবা আসবাবপত্র ঝাড়পোঁছ করছে, বাতি জ্বালাচ্ছে কিংবা নেভাচ্ছে অর্থাৎ পরীক্ষা করে দেখছে সবই ঠিকঠাক আছে কিনা। হলের ভেতরটা সত্যিকার অর্থেই ঝকমক করছে। সিলভার ওয়ের অর্থাৎ ভোজসভায় ব্যবহারের জন্যে রূপোর ছুরি-কাঁটা চামচ, ঝকঝকে মোমবাতি দানি, চকচকে ক্রুয়েট (লবণ, পিষা গোলমরিচ ও অন্যান্য টুকিটাকি দ্রব্যাদি রাখার জন্যে রৌপ্য পাত্র) বিভিন্ন ধরনের গ্লাস ও প্লেট টেবিলে সাজানো হচ্ছে। আগামীকাল এখানে মহোৎসব হবে এটা স্পষ্টই উপলব্ধি

www.pathagar.com

করা যায়। আমাদের পথ প্রদর্শিকা রীতা জানাল যে, আগামীকাল টেলিভিশনে পূর্ণভাবে দেখানো হবে। দুধের স্বাদ ঘোলেই মিটাব। ব্লু হলের ভেতরটা, মেঝের প্রসিদ্ধ মোজায়েক, দেয়াল চিত্র এবং আরও অন্যান্য বহু দর্শনীয় দ্রব্যাদি চোখের আড়ালেই রয়ে গেল।

ছবিতে ষ্টাডহুসেট (সিটি হল) রিগসডাগহুসেট (পার্লামেন্ট হাউস) এবং রিডারহোলমস কিকরাণ (রিডারহোলম দ্বীপের বিখ্যাত গীর্জা)

সিটি হলের সামনে মেলারেন লেকের তীরে ৪৫ ফিট উঁচুস্তম্ভের উপর সুইডেনের বীর সৈনিক এনগেলব্রেক্টের ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপিত আছে। ১৪৩০ খৃস্টাব্দে তিনি ডেনমার্কের প্রভুত্ব থেকে সুইডেনবাসীদের মুক্ত করেছিলেন। ১৪৩৫ খৃস্টাব্দে এনগেলব্রেক্টই সুইডিশ ইতিহাসে প্রথম বিধান সভা গঠন করেন এবং পার্লামেন্ট অধিবেশন আহ্বান করেন। এনগেলব্রেক্টই পার্লামেন্টের মাধ্যমে নূতন শাসন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। সুইডেনের ইতিহাসে এরই জন্যে তাঁর একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা এনগেলব্রেক্টের স্মৃতিকে চিরজাগরিত রাখার জন্যেই সিটিহলের সামনে সুইডেনের বীর সৈনিক এনগেলব্রেক্টের ব্রঞ্জের মূর্তি মেলারেন লেকের তীরে ৪৫ ফিট উঁচু স্তম্ভের উপর স্থাপন করা হয়েছে।

আমরা স্টাডহুসেট দেখে ঘরের পানে রওয়ানা হলাম।

www.pathagar.com

দেশ গড়ার ক্ষেত্রে সুইডিশবাসীদের অবদান

সুইডেন ভ্রমণের নির্ধারিত দিনগুলো একে এক শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্র ২ দিন আছে। এই সময়ের মধ্যেই যা কিছু দেখবার দেখে নিতে হবে এবং যাদের সাথে মিলবার মিলে নিতে হবে। কিছু বাংলাদেশী পরিবারের সাথে আমাদের মোলাকাত হয়েছে এবং তারা বিদেশে অত্যন্ত স্বজন বনে গেছেন, দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করাও কর্তব্যে দাঁড়িয়েছে।

সারাদিন ঘোরাফেরা করে সন্ধ্যায় যখন বাসায় ফিরি তখন পা ভারী হয়ে ওঠে। আমার নিজের "ডিপেন্ডেন্ট ইডিমা" আছে অর্থাৎ পা নিচু করে রাখলে ধীরে ধীরে পায়ে পানি জমে যায়, পা টাটিয়ে ওঠে। আরামের জন্যে এবং পরদিন নিজেকে কর্মক্ষম করে তোলার জন্যে, সন্ধ্যায় বসবার ঘরে পা উঁচু করে বসে থাকতে হয়। তাহলেই আস্তে আস্তে পানিটা সরে যায় এবং কষ্ট অনেকটা লাঘব হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে মন চায় না তবু শারীরিক ও মানসিক কষ্ট উপেক্ষা করে লৌকিকতার খাতিরে যেতেই হয়। সাময়িকভাবে সে মুহূর্তগুলো অত্যন্ত কষ্টকর মনে হলেও পরবর্তীকালে স্মৃতি মন্থনে সেই মুহূর্তগুলোই অতি মধুর, আমেজময় মনে হয়।

সুইডেনের ১০ দিনের মধ্যে তিনটি সন্ধ্যা কাঁটিয়েছি বাংগালি পরিবারের ঘরোয়া সান্নিধ্যে। একদিন গিয়েছিলাম জনাব পিয়ার আলি সাহেবের বাসায় সে বর্ণনা সপ্তম অধ্যায়ে দিয়েছি। একদিন গেলাম সৈয়দ আহসান আহমেদ সাহেবের বাসায়। তিনি আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের মধ্যেই পড়েন। আমার সহোদর ভাই ডক্টর আতিকুর রহমানের পত্নী এমিলির মামাত ভাই হলেন আহসান আহমেদ সাহেব। এরা সকলেই ফরিদপুরের লাল মিয়া, মোহন মিয়ার বংশোদ্ভূত। আহসান সাহেবরা চার ভাইই বর্তমানে সুইডেনে থাকেন এবং শেলীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী এরা চার ভাই চার প্রকৃতির। এদের বৈশিষ্ট্য হলো যে, বড় ভাই ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, বলা যায় ধর্ম মানেন না, দ্বিতীয় ভাই ধর্মনিরপেক্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাই তবলীগপন্থী। তবে এর মাঝে তৃতীয় জন একটু বেশী গোঁড়া এবং মনে করেন যে, মাওলানা ও মৌলভীরা ধর্মকে সঠিকভাবে অনুসরণ করছেন না। প্রথম দুই ভাই সুইডিশদের জীবনধারা গ্রহণ করেছেন এবং শেষের দুই ভাই ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে আঁকড়ে ধরে আছেন। তাদের শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান আমাদের সাথে দেখা করার জন্যে হাশেম সাহেবের বাসায় এসেছিলেন এবং তাঁকে দেখলাম আমাদের দেশীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধর্মপরায়ণ ভারিক্কি মহিলার মত।

www.pathagar.com

এ সব নৈশভোজে খাবার-দাবার হয় দারুণ। আমাদের বাংলাদেশীয় গৃহিণীরা শুধুই ঘরকন্না করেন বলে হাতে পান প্রচুর সময় এবং কালেভদ্রে স্বদেশী মেহমান পেলে একদিনেই দশ দিনের আদর-আপ্যায়নের আনন্দ পেতে চান। এখানে খাদ্য দ্রব্যের তালিকায় মাছ, গোস্ত, শাকসবজী, তেল, ঘি ও মশলা সবই বিশুদ্ধ খাঁটি বলে গৃহিণীরা রান্নায় তৃপ্তি পান এবং স্বাদও হয় অভাবনীয়। বিশেষ করে দেশবাসীর জন্যে দরদ দিয়ে ও সময় দিয়ে যে রান্না করা হয় তা হয়ে থাকে অমৃত সমান এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাদের আদর-আপ্যায়ন সে মুহূর্তে আমাদের উদরের জন্যে গুরুভার হলেও স্মৃতির পাতায় অম্লান ও অক্ষয় হয়ে আছে আজও।

খাওয়া-দাওয়ার সাথে সাথে তাদের জীবনের অনেক খুঁটি-নাটি বিষয়ের উপরই আলাপ হয়। উপলব্ধি করতে পারি যে, তারা সুইডেনের সুখ-দুঃখের সাথে নিজেদেরকে এক সূত্রে বেঁধে নিতে মনে প্রাণে চেষ্টা করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নিজেদের একান্ত ভাবেই সুইডিশ ভাবে। এখানে বর্ণবৈষম্যের নগ্নরূপ সমাজ জীবনে আত্ম প্রকাশ করে না বলে কচি মনে কোন প্রকার জটিলতা রেখাপাত করে না এবং মনোমালিন্য গড়ে ওঠে না। এই বিচারে বাংলাদেশীরা সুইডেনে বেশ ভালই আছে। একদিন গেলাম হাশেম পরিবারের বন্ধু মোকাব্বর সাহেবদের বাসায়। মোকাব্বর সাহেব সুইডেনের বর্তমান অর্থনীতির উপর আলোকপাত করলেন। তিনি জানালেন যে, বর্তমানে এদের অর্থনীতিতে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এদের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এদের লৌহ খনি ও খনিজ পদার্থ আছে বলে তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বললেন যে, এই জাতি অত্যন্ত কর্মঠ এবং বর্তমানে অতি উন্নতমানের শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে এদের নির্মাণ কোম্পানিসমূহ মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্তানে অনেকগুলো বড় বড় কনট্রাক্ট পেয়েছে। নিজেদের দেশকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্যে জাপান ও আমেরিকা থেকে বিনিয়োগ আনছে। জাপানের মিৎসুবিসি সুইডেনের গাড়ী কোম্পানি "ভলভো" তে বেশ বড় রকমের বিনিয়োগ করেছে। আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানির সাথে সুইডেনের "সা আ ব" হাত মিলিয়েছে। এভাবেই আরও বড় বড় সুইডেনের কোম্পানিসমূহ বিদেশী কোম্পানির সাথে যৌথ উদ্যোগে কাজ করার ব্যবস্থা করে ফেলেছে এবং আরো সম্প্রসারণের জন্যে সুযোগ সন্ধান করছে।

সুইডেনে শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরি, বেতন ও ভাতা অত্যধিক বেশী। তবু বিদেশীরা এখানে অর্থ বিনিয়োগ করে সুইডিশ শ্রমিকদের দ্বারা দ্রব্যাদি উৎপাদন করে, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবু তারা পারছে-কারণঃ

প্রথমত অতি উন্নতমানের দ্রব্যাদি এখানে তৈরি হয় এবং যারাই মজবুত, সুন্দর উন্নতমান চায় তারা খোলা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সুইডেনে উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মান ও মূল্যের বিচারে গ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচনা করে থাকে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত এ দেশে শ্রমিকপ্রতি দ্রব্য উৎপাদনের হার আমাদের দেশের তুলনায় ত অনেক বেশী, এমন কি ইউরোপের তুলনায়ও কোন অংশে কম নয়। মনে পড়ে, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে জাহাজ ক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্যে ১৯৭৫ সালে জার্মানিতে গিয়েছিলাম। সে সময় ইংল্যান্ডের তুলনায় জার্মানির শ্রমিক মজুরি প্রায় দেড় গুণ ছিল। দুটোই শিল্পোন্নত দেশ-প্রশ্ন জেগেছিল মনে যে খোলাবাজারে ইউরোপে জার্মানি কিভাবে সর্বনিম্ন দরপত্র দেয়। উত্তরে জার্মানির এক শিল্পপতি জানিয়েছিলেন যে, জার্মানির শ্রমিকদের মনোবল, কর্মদক্ষতা ও শ্রমিকপ্রতি উৎপাদন হার ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় দ্বিগুণ। তাই তাদের উৎপাদন ব্যয় কম। সুইডেনের বেলাতেও জার্মানির এই যুক্তি খাটে।

তৃতীয়ত অধিক হারে উৎপাদনক্ষম আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। সুইডেন এক্ষেত্রে শুধু আধুনিক নয় অত্যাধুনিক। তাই তাদের উৎপাদন ব্যয় কম।

চতুর্থত শ্রমিক আন্দোলন ও সমস্যা নেই বললেই চলে। তাই উৎপাদন ব্যাহত হয় না। ধর্মঘটের দরুন দিনের পর দিন কল-কারখানা অব্যবহৃত থাকে না এবং শ্রমিকরাও বিনা শ্রমে মজুরি পেতে থাকে না।

পঞ্চমত দেশের পরিকল্পনাবিদগণ দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদন প্ল্যান এবং বাজারজাতকরণ প্ল্যান নিশ্চয়তার সাথে তৈরি করতে পারেন এবং কার্যকর করতে পারেন।

মোকাব্বের সাহেব মনে করেন যে, বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে এসেছেন তারা সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। এখানকার লোকগুলো অনেক ভদ্র তাই আমাদের অনেক ভুল-ত্রুটি তারা দেখেও দেখে না। ইউরোপেরই অন্যান্য দেশে এরূপ নয়। হাশেম সাহেবের মতও অনুরূপ। মোকাব্বর সাহেব দুঃখ করে জানালেন যে, বিদেশীরা এখানে এসে এই দেশের প্রথা, এ দেশের আইন-কানুন নষ্ট করে দিচ্ছে। সুইডেনবাসীরা আইন মেনে চলতে অভ্যস্ত কিন্তু বহিরাগতরা সাধারণতঃই বাধ্য না হলে আইনের ধার ধারতে চায় না। তিনি দেখেছেন যে, স্থানীয় সরকার এ ব্যাপারে অনেক সময় বহিরাগতদের দোষারোপ করে। আমি আর একটু পরিষ্কার করে বলার জন্যে মোকাব্বের সাহেবকে অনুরোধ করাতে তিনি উদাহরণ দিয়েই বললেন যে, এদেশীয় লোকেরা সবকিছুই লাইনে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে করতে চায় কিন্তু বিদেশীরা সুযোগ পেলেই লাইন ভাঙ্গবে। সুইডেন বাসীরা ধৈর্যশীল এবং কোন যানজটে কিংবা ঝঞ্ঝাটে পড়লে বলবে "ভেনটা" অর্থাৎ অপেক্ষা কর। এই শব্দটির ব্যবহার সর্বত্র। রাস্তাঘাটে, দোকানে, স্টেশনে "ভেনটা" শব্দ শোনা যায়। আমাদের দেশে যদি "একটু সবুর করুন" শব্দ কটি প্রচলিত হতো তাহলে রাস্তাঘাটে ধাক্কা ধাক্কি অনেকটা কমে যেত। ইংল্যান্ডে "একস্‌কিউজ মি" মানে আমাকে অনুগ্রহ করুন এবং "থ্যাংক ইউ" অর্থাৎ আপনাকে ধন্যবাদ-শব্দগুলোর মধ্যে একটা নমনীয়তা ও সহনশীলতার ভাব আছে। আমাদের দেশে এরূপ শব্দমালার ব্যবহার নেই। মোকাব্বের সাহেব বললেন বলেই আমি তার

www.pathagar.com

পুনরাবৃত্তি করছি তা নয় সুইডেনের রাস্তায় ১০ দিন ধরে চলেছি-বাজারে রাস্তায়, স্টেশনে কোথাও কোন দিন এক মুহূর্তের জন্যেও চেঁচামেচি কিংবা হট্টগোল দেখিনি। যে যার কাজ করে যাচ্ছে অন্যের কাজ দেখার জন্যে ভীড় করে দাঁড়াচ্ছে না।

সুইডেনে বাংলাদেশীরা এসেছে চাকরির সন্ধানে। বর্তমানে বহিরাগতদের সুইডেন প্রবেশে অনেক কড়াকড়ি থাকাতে বাংলাদেশীদের এখানে আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখানে যারা কাজ করছে তারা সবই নিম্নমানের চাকরিই করছে। শুধু পিয়ার আলি সাহেবই একটু উঁচু পর্যায়ে আছেন। অনেকে ব্যক্তি মালিকানাধীন দোকানে, ডিপার্টমেন্ট স্টোরে, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে এবং সরকারী ছোট ছোট অফিসে কাজ করছে। সুবিধা এখানে যে চাকরি না থাকলেও কেউ দুর্দশাগ্রস্ত বলে বিবেচিত হয় না। কেন? সে বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। ঘরোয়া পরিবেশে বাংলাদেশীদের সাথে আলাপ করে দেখেছি যে, ছোট খাট চাকুরেরাও যে সংস্থাতে চাকুরি করে সেখান থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। যেমন দোকানে কাজ করলে নিজের ঘরের জন্যে দোকানের ক্রয়মূল্যে জিনিষপত্র কিনে নিতে পারে। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে কাজ করলে বিনে পয়সায় ভ্রমণ সুবিধা পাবে ইত্যাদি।

সুইডেনে শিক্ষার হার শতকরা ১০০ ভাগ। ডক্টর পিয়ার আলি সাহেব বলেছিলেন যে, চার্চসমূহে প্রাথমিক শিক্ষার ভার থাকার কারণেই দ্রুত শিক্ষার হার বেড়েছিল। তিনি মনে করেন যে, আমাদের দেশেও মসজিদগুলোর ব্যবহারে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো যায় এবং দেশকে অশিক্ষার দৈন্য থেকে মুক্ত করা যায়।

সুইডেনের বর্তমানে সমস্যা হচ্ছে নিম্নমুখী জনসংখ্যার হার। আমাদের দেশে যেখানে ১৮ বছর বয়েসের নিচে জনসংখ্যা প্রায় ৬০% এবং উর্ধ্বে প্রায় ৪০%; সুইডেনে তা হচ্ছে যথাক্রমে ২৫% এবং ৭৫%। সুইডেনে কর্মক্ষম জনসংখ্যা হচ্ছে সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৭০ ভাগ এবং বয়োবৃদ্ধ যাদের কাজ করার ক্ষমতাই নেই এবং স্টেটের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাদের সংখ্যানুপাত হবে ৫%। আমাদের দেশে ১৮ বছরের উপর ৪০% এবং তা থেকে জয়িফ অর্থাৎ একদম কর্মক্ষম নয়, তা বাদ দিলে কর্মক্ষম জনসংখ্যা হবে ৩৫%। সুইডেনের ৭০% স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই জাতীয় পর্যায়ে কাজ করতে পারে। আর আমাদের এখানে ৩৫%-এর অর্ধেক নারী বলে ঘরকন্না ছাড়া জাতীয় পর্যায়ে কাজ করতে অক্ষম। এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে যেখানে সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ১৭.৫% জাতীয় কাজে কাঁধ লাগাচ্ছে, সুইডেনে সেখানে ৭০% জাতীয় কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করছে। সে দেশের উন্নতি ও প্রগতির হার আমাদের চেয়ে অনেক বেশী হবে এটাই স্বাভাবিক।

বিদেশে বসে দেশের তুলনামূলক চিত্র এঁকে হতাশার গোলক ধাঁধায় ভুগি। তবু মনে হয় আমাদের দেশে সেই ক্ষণ কবে আসবে যখন কথায় রাজা-উজির না মেরে আমাদের কর্মফল দিয়ে প্রতিপন্ন করতে পারব যে, আমরাও সক্ষম মানুষ এবং আমাদেরও গণনায় আনতে হবে। সেই আশায়ই দিন গুনি এবং সে দিনেরই স্বপ্ন দেখি।

www.pathagar.com

।। ২০ ।।

বিদায় সুইডেন-শান্তির দেশ

সকালে ৯ টায় শেষ দিনের জন্যে স্টকহল্‌ম দেখব বলে বেরিয়ে পড়লাম। এখনও কাকনাস টাওয়ার-এ ওঠা হয়নি, ছোট দুই বগিবিশিষ্ট অনেকটা খেলনার মত ট্রেনে চড়া হয়নি এবং ন্যাশনাল মিউজিয়ামে যাওয়া হয়নি। তাই বেরিয়ে পড়লাম স্টকহল্‌মের হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায়।

আমরা ভূনিম্ন ট্রেনে করে স্লুসেন গেলাম এবং সেখান থেকে ছোট ট্রেন ধরলাম ফিস্কসাত্রার দিকে যাব বলে। এই ট্রেনগুলো চওড়ায় অন্যান্য টুনেলবানানের মতই তবে এখানে থাকে মাত্র দুটো বগি এবং চলে একটু ধীর গতিতে। পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানে তীক্ষ্ণ বাঁক আছে, উঁচু-নিচু রাস্তা পেরিয়ে যেতে হয় সেখানে এ ধরনের ট্রেন ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই ট্রেনে যাবার সময় মনে হয় যেন লুকোচুরি খেলছি। এই দেখা যাচ্ছে এই নেই। পাহাড়ের ঢালে কিংবা বাড়িটার আড়ালে লুকিয়ে গেল। তাই আমি এই ট্রেনকে লুকোচুরি খেলার ট্রেন নাম দিয়েছি। এই ট্রেনে বসে বসেই শহরতলীতে গ্রামীণ চিত্র দেখা যায়। দেখা যায় সুইডেনবাসীদেরজীবন যাত্রা। হুস করে কারও কিচেন গার্ডেনের অর্থাৎ বাসাসংলগ্ন ছোট সব্জী বাগানের পাশ দিয়ে কিংবা কারও বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে যাবার সময় দেখা যাবে ঘরোয়া চিত্র। পেছনের বাগানে কেউ কাপড় শুকোতে দিচ্ছে কেউ সামনে বাগানে কাজ করছে। শান্ত পরিবেশ। তারপর হয়ত একটু পরই এই ট্রেন থামলো এমন স্থানে যাকে গাড়ীর স্টেশন বলা যাবে না। অতি সাধারণ বাস স্টপেজের মত একটু ছাউনিঘেরা জায়গা। টিকেট বিক্রির বালাই নেই, টিকেট চেকারের ঝামেলা নেই। প্রতি স্টেশনেই দু'একজন নামছে এবং দু'একজন উঠছে। মনে হয় শান্ত জীবন ছোট নদীর মত আপন মনে বয়ে চলেছে।

আমরা ফিস্কসাত্রা অঞ্চল দিয়ে চলছি। ফিস্ক সাত্রা ষ্টেশনটি পার হলাম। ফিস্ক-এর মানে হচ্ছে মাছ। হাশেম সাহেব জানালেন যে, এই শহরটির প্রতিটি রাস্তার নাম হচ্ছে মাছের নাম দিয়ে। যেমন "ব্র্যাকসন গাটা" ব্যাকসন হচ্ছে এক ধরনের মাছ আর গাটা হচ্ছে রাস্তা অর্থাৎ "ব্র্যাকসন রাস্তা" অনুরূপভাবে নামকরণ করা হয়েছে। "সিক গাটা" মানে সিকমাছের রাস্তা। এ ভাবেই আরও অনেক রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। সুইডেনবাসীরা এ ধরনের অনেক বৈচিত্র্যময় কাজ করে থাকে। টুনেলবানানের বিভিন্ন স্টেশনে চিত্রশিল্পের বাহার এ ধরনেরই একটা বাতিক যা সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছি। আমরা যতই দূরে যেতে থাকলাম গ্রামীণ চিত্র ততই বেশী করে ফুটে উঠতে থাকলো। এই ছোট্ট ট্রেনগুলো

www.pathagar.com

পাহাড়ী অঞ্চলেই বেশী চলে এবং সত্যিকার উপশহরের রূপ দেখতে হলে পর্যটকদের অবশ্যই এই ছোট ট্রেনে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।

আমাদের হাতে প্রচুর সময় নেই তাই আমরা এই ট্রেন ভ্রমণের আনন্দে মেতে থাকতে পারলাম না। আমরা কাকনাস টাওয়ার দেখার জন্যে যুরগার্ডেন দ্বীপের পথে রওয়ানা হলাম। বাস রুটের পাশেই সুইডেনের [illegible] মিউজিয়াম "ন্যাশনাল মিউজিয়াম" পড়বে। কিন্তু দিনের আলো থাকতে থাকতে কাকনাস টাওয়ার এবং যুরগার্ডেনের উপভোগ্য বাস ভ্রমণটা শেষ করতে হবে তাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা সরাসরি কাকনাস টাওয়ারে যাব এবং [illegible] ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখে ঘরে ফিরব। স্টকহলমে ছোট-বড় [illegible] মিউজিয়াম রয়েছে। শুধু যুরগার্ডেন দ্বীপেই রয়েছে [illegible] মিউজিয়াম, [illegible] মিউজিয়াম, বায়োলজিক্যাল মিউজিয়াম, (ফ্যাসিকেলেট্রিয়ন [illegible] পুরোনো দিনের প্রত্নতাত্ত্বিক যাদুঘর) এবং [illegible] (চিত্রকলা এবং হস্তশিল্পের মিউজিয়াম), স্কানসেন সংলগ্ন একটা [illegible] বাদ্যযন্ত্রের মিউজিয়াম, স্কানসেন মুক্তাঙ্গন মিউজিয়াম (৭৫ একর জমির উপর স্থাপিত, পৃথিবীর সর্বপ্রথম উন্মুক্ত যাদুঘর, ১৮৯১ সনে আর্তর হ্যাজেলিয়াস সৃষ্টি করেছিলেন। সুইডেনবাসীদের পূর্বপুরুষ কিভাবে জীবন যাপন করত, তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি কেমন ছিল তার [illegible] এর [illegible] মিনি চিড়িয়াখানাও এ [illegible] স্কানসেন [illegible] (চিত্রশিল্পের যাদুঘর), [illegible] এবং কা[illegible]।

[illegible] ডেনে [illegible] স্টকহলম [illegible] উপর [illegible] ঘুরা রাস্তায় টিলার উপর [illegible] টাওয়ার চত্বরে উপস্থিত হলাম। চত্বরটি বর্গাকৃতি এবং [illegible] হবে। টাওয়ারটি [illegible] অবস্থিত। [illegible] ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের [illegible] [illegible] ১৯৬৭ সনে [illegible] সর্বোচ্চ টাওয়ার [illegible] হিসেব করে দেখা গেছে যে, এই টাওয়ারে [illegible] ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ এর ওজন [illegible] টন। [illegible] বড় লিফট সর্বক্ষণ উপর-নিচ [illegible] মিনিটের মত। এই টাওয়ারের ৩০ তলায় রয়েছে রেস্তোরাঁ এবং ৩১ তলায় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। ৩১ তলাটি ৮ টি সমবাহু বিশিষ্ট এবং এর আয়তন হবে প্রায় ২৫০০ বর্গফিটের মত। ৮ বাহুর প্রত্যেক দিকেই ১টি শক্তিশালী টেলিস্কোপ স্থাপন করা হয়েছে যা দিয়ে ৬০ কিলোমিটার দূরের দৃশ্য দেখা যায়,

www.pathagar.com

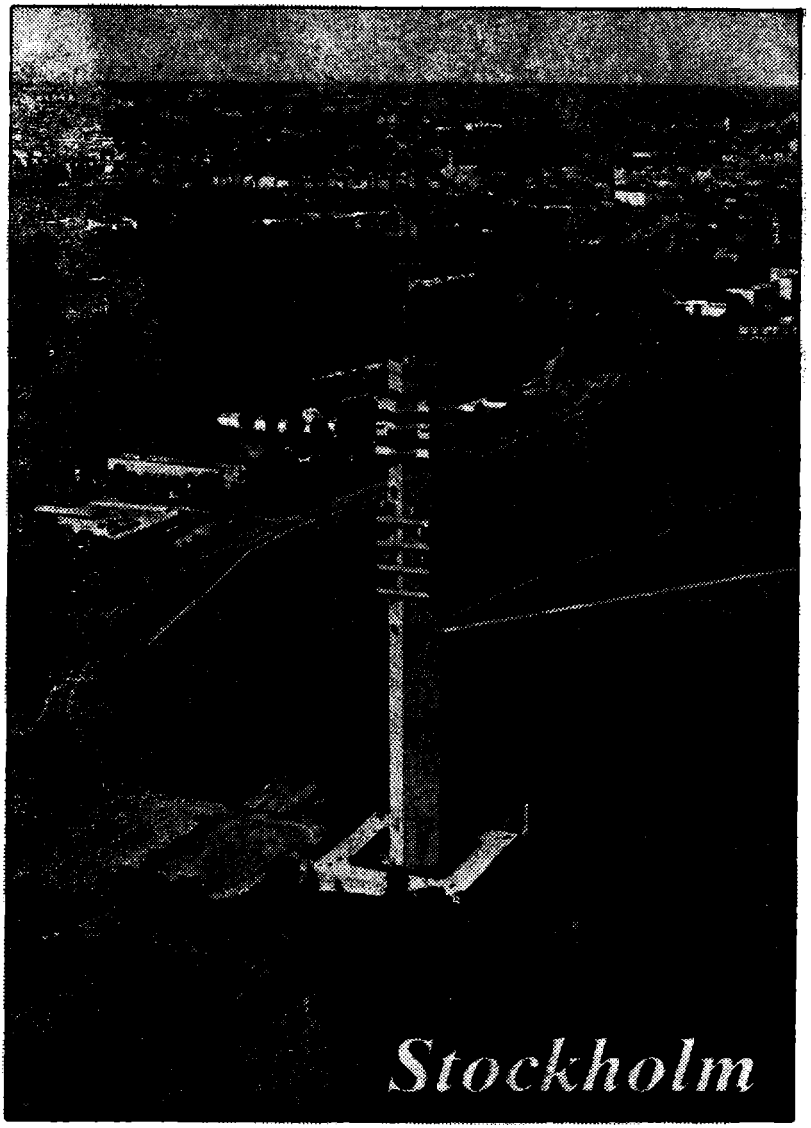

কাকণাস টাওয়ার দূরে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দ্বীপ সহর ষ্টকহলম

আজকে দিনটা মোটেই সুবিধাজনক নয় তবু কখনও কখনও মেঘের স্তর সরে গেলে কিংবা নিচে কুয়াশা হালকা হলে আমরা কিছু অংশ দেখার সুযোগ পেতাম। এভাবেই প্রকৃতির সাথে লুকোচুরি খেলে আমরা দেখতে পেলাম পূর্ব দিকে বাল্টিক

www.pathagar.com

সাগরের তীর ঘেঁষে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নীলসাগরে ফোঁটা ফোঁটা বিন্দুবৎ দ্বীপসমূহ। উপর থেকে দেখা যাচ্ছিল নীল সাগর দূরে মিলিয়ে গেছে। যতটুকু দেখা যায় তা সবই সবুজ নীল সরু পাড় দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছবির মত মনে হয়। বাল্টিক সাগরে ২৪০০০ দ্বীপের সমন্বয়ে উত্তর-দক্ষিণে ১৫০ মাইল বিস্তৃত সুইডেনের দ্বীপপুঞ্জ সকল মৌসুমেই পর্যটকদের বিরাট আকর্ষণ। গ্রীষ্মকালে ভীড় বেশী। পর্যটকদের নিয়ে ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের এত নৌকো, জাহাজ এবং প্রমোদতরী দ্বীপসমূহকে ঘিরে চলাফেরা করে যেন মনে হয় সমুদ্রে মেলা বসেছে।

উত্তর দিকে গাঢ় অবিচ্ছেদ্য সবুজ বনভূমি হালকা কুয়াশা ভেদ করে কখনও কখনও উঁকি দিচ্ছিল। শুনেছি পরিষ্কার দিনে উত্তরে সিগটুনা পর্যন্ত দেখা যায়। দেখা যায় কি সুন্দরভাবে লেক মেলারেন সমস্ত বনভূমিকে জড়িয়ে ধরে আছে। উত্তর দিকে ঘন সবুজের পর্দা ভেদ করে ঘননীল সরোবরের চাঁদমুখ বের করে যেন আমাদের দিকেই নির্নিমেখ চেয়ে আছে। নীলাভ আকাশ, ঘনসবুজ বনভূমি, ঘন নীল সরোবর আর প্রজাপতির মত নিজ আনন্দে উড়ে চলা মেঘরাজি ও হেঁয়ালি কুয়াশার অবগুণ্ঠনে কাকনাস টাওয়ারের ৩১ তলাটাকে স্বপ্নপুরীর একটি অংশ মনে হচ্ছিল।

পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে দেখা যাচ্ছিল সবুজ আর নীলের অঙ্গাঙ্গি অবস্থান। দূরের দৃশ্যসমূহ চকিতে ভেসে উঠছিল আবার চকিতেই মিলিয়ে যাচ্ছিল তাই অখণ্ড ভূচিত্র দেখতে পাচ্ছিলাম না। দেখতে পাইনি দূরে অবস্থিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ। তবে ধারণা করতে পেরেছি যে, কাকনাস টাওয়ার একটি সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল দিনে সুইডেনের সৌন্দর্য পূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলতে কোন প্রকার কৃপণতা করে না।

আমাদের হাতে খুব একটা সময় নেই, তাই ছুটলাম ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখতে। আমরা যখন মিউজিয়ামে পৌঁছলাম তখন বেলা ২ টা। হাশেম সাহেব লবিতে অপেক্ষা করবেন। আমি ও আমার গৃহিণী টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকে গেলাম। আমাদের ওভারকোট ও হাতব্যাগ একটা লকারে রেখে যেতে হবে এবং এক ক্রোনার জমা দিয়ে লকারের চাবি নিতে হবে। এই ক্রোনারটি লকার ভাড়া নয়। চাবি সংরক্ষণ ব্যবস্থা। চাবি ফেরত দিলেই শুধু ক্রোনারটি ফেরত দেয়া হবে। বড় মিউজিয়াম। সাধারণভাবে দেখতে গেলেও সারাদিন লেগে যাবে। আমাদের হাতে এতটা সময় নেই তাই চোখ বুলিয়ে যাবার উদ্দেশ্য নিয়েই ভেতরে ঢুকলাম। এই মিউজিয়ামের সংগ্রহ সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকে। রাজা গুষ্টভ III এর সংগ্রহই অধিক। রাণী ক্রিস্টিনা যখন রাজ্য ত্যাগ করে ইটালিতে চলে যান তখন সেখান থেকে ইটালির পুনর্জাগমান মাস্টারদের বেশ কিছু তৈলচিত্র তিনি সংগ্রহ করেন এবং এই মিউজিয়ামকে দান করেন। কার্ল গুষ্টভ টেসিন বলে ফ্রান্সে নিয়োজিত

www.pathagar.com

সুইডেনের রাষ্ট্রদূত ১৭৪০ খৃস্টাব্দে ফরাসী দেশ থেকে অনেক মূল্যবান তৈলচিত্র এই মিউজিয়ামটির জন্যে আনেন। রাজা গুষ্টভ III তার নিজের সমস্ত সংগ্রহ এবং বিভিন্ন জায়গায় রাজাদের সংগ্রহ আইন করে সুইডেনের জাতীয় সম্পদ বলে ঘোষণা করেন এবং সমস্ত সংগ্রহ এই মিউজিয়ামে রক্ষিত হবে বলে স্থির করেন। এভাবেই রেমব্রান্ট, রুবেন্স, গয়া, রেঁনোয়া এবং আরও বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের ১২৫০০ শিল্পকর্ম এবং ভাস্কর্য এখানে রক্ষিত আছে। তাছাড়া মুদ্রিত ছবি ও নকশা রয়েছে ৫০০,০০০ এর মত। অলঙ্কৃত শিল্পকর্ম রয়েছে ৩০০০০ এবং অসংখ্য চীনেমাটির ও কাঁচের বাসন-কোসন যুগ যুগ ধরে অত্যধিক ফ্যাশনসমৃদ্ধ আসবাবপত্র ও ঘর সাজানোর দ্রব্যাদিতে এই মিউজিয়ামটি ভরপুর। এসব দেখে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, এই জাতির পেছনে যে ইতিহাস রয়েছে তা হচ্ছে সৃজনশীলতার ইতিহাস, বলিষ্ঠতার ইতিহাস এবং প্রগতির ইতিহাস।

মিউজিয়াম দেখে ঘরে ফিরলাম সাঁঝবেলায়। আজ বিদায়ের আগের দিন তাই স্থির করলাম যে, হাশেম পরিবারের সাথে একান্তভাবে গল্প-গুজবে দিনটা কাটাব।

১২ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার-সকাল ৫ টায় হাশেম পরিবারের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আরলান্ডা বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ৭ টায় ফজরের ওয়াক্ত। হাশেম সাহেব বিমান বন্দরের প্রার্থনাকক্ষে আমাদের নিয়ে গেলেন। বড় হল ঘর। অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা হয়েছে। দেখলাম যে একদিকে বেশী কিছু চেয়ার, মোমবাতি ও ঘন্টা রয়েছে। খৃস্টানদের উপাসনালয়ের মত সাজানো। অন্যদিকে দেখলাম জায়নামাজ রাখা আছে এবং কাবার দিক নির্দেশনা চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই ঘরে মুসলিমরাও নামাজ পড়তে পারে। এই ব্যবস্থা দেখে তাদের মনের উদারতার পরিচয় পেলাম। বলতে লজ্জাবোধ করছি যে, ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত মুসলিম দেশের রাজধানী ঢাকা জিয়া বিমান বন্দরে সিঁড়ির নিচে যে নামাজ ঘরটি আছে তা আরল্যান্ডা বিমান বন্দরের নামাজ ঘরটার চাইতে নিকৃষ্ট ও অপরিষ্কার।

বিদায়লগ্নে মনে হচ্ছে-একদিন সুইডেন দেখার স্বপ্নে ছিলাম বিভোর। আর আজ "এসেছি, দেখেছি এবং জয় করেছি" অভিজ্ঞতা চয়ন করেছি অনেকখানি, কিন্তু শেষ হয়েছে রঙিন মধুর স্বপ্ন। জীবনটাই এরূপ। এক বোঝা স্মৃতি নিয়ে আজ কিছুক্ষণের মধ্যেই সুইডেন থেকে ফিরে যাচ্ছি।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কমোডর (অবঃ) আতাউর রহমান নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত প্রভাকরদি গ্রামে সম্ভ্রান্ত মিয়া পরিবারে ১৯২৬ সালের ১৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি কলকাতার শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ১৯৫০ সালে পাকিস্তান নেভীতে সাব লেফটেন্যান্ট হিসাবে যোগ দেন। ইংল্যাণ্ডের প্লিমাউথের ম্যানাডন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন ১৯৫১ সালে। দেশে-বিদেশে দীর্ঘ ২৬ বছর নৌবাহিনীতে চাকুরীর পর ১৯৭৬ সালে কমোডর হিসাবে নেভী থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর নৌজীবনের প্রায় ৮ বছর কেটেছে জাহাজে জাহাজে, সাগর থেকে সাগরে, বন্দর থেকে বন্দরে। ৪ বছর কেটেছে ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে লন্ডনে ডেপুটি নেভাল অ্যাডভাইজার হিসাবে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৩-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানে অন্তরীণ ছিলেন।

১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ সরকারের সচিবের পদমর্যাদায় কাজ করেন এবং ১৯৮৪ সালের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অবসর গ্রহণের পরও তাঁর জীবনের উত্তাল তরঙ্গ আগের মতই বইতে থাকে এবং তিনি একাধারে ইবনে সিনা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসাবে সংস্থাটির বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়েন, মানারত ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান হিসাবে দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর ধরে হাল ধরে আছেন, ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসাবে প্রায় দীর্ঘ ১২ বছর ধরে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, ফায়সাল ইনভেস্টম্যান্ট ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান হিসাবে প্রায় ৮ বছর ধরে জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, ইত্যাকার নানাবিধ কাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে এখনও সম্পৃক্ত আছেন।

প্রকাশক